পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
স্মারক বক্তৃতা—২০০৯

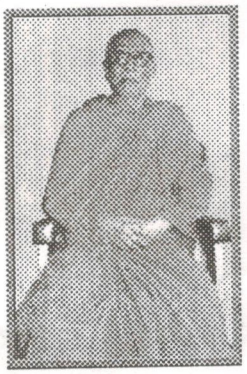

অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধ চেতনা

সুনীতি কুমার পাঠক

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি

ও

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
স্মারক বক্তৃতা—২০০৯

অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধ চেতনা

সুনীতি কুমার পাঠক

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধ চেতনা
সুনীতি কুমার পাঠক

স্বত্বাধিকারী : প্রকাশ সংস্থা

প্রকাশকাল : জুলাই ২০০৯

প্রকাশক : সুজিত কুমার বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
৫০/টি/১এ পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কলকাতা - ৭০০ ০১৫

মুদ্রক : নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১ ঝামা পুকুর লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ৫ টাকা

মুখবন্ধ

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন বিংশ শতকে ভারত-বাংলাদেশের বৌদ্ধ গগনে বিরাজিত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি জ্ঞানে-গরিমায়, ধর্মে-বিনয়ে এবং ত্যাগে-তিতিক্ষায় ছিলেন একজন পরমারাধ্য ভিক্ষু ব্যক্তিত্ব।

তিনি বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ও বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মধ্যম নিকায় (২য় খণ্ড), মিলিন্দ প্রশ্ন, ধর্মপদ, শাসনবংশ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নে বৌদ্ধ দর্শন। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা এবং স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয় "বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন" গ্রন্থে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহে। তাঁর অসামান্য মেধা, স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানের গভীরতার জন্য তিনি বিদ্বজ্জন কর্ত্তৃক "পণ্ডিত" আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। মহাস্থবিরের জীবিতাবস্থায় তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মিলে। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে বি. সি. লাহা স্বর্ণপদক দ্বারা বিভূষিত করেন। পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতি তাঁকে সার্টিফিকেট-অব-অনার প্রদান করে সম্মানিত করেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন পটারী রোডের নাম পণ্ডিত ধর্মাধার সরণীতে পরিবর্তন করে তাঁর স্মৃতি অমর রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কল্যাণকামী ও দয়াময় ব্যক্তিত্বের জন্য অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ও ধর্মাধার সেবা কমিটি। শেষোক্ত কমিটির সদস্যরা শেষ বয়সে মহাস্থবিরের সেবা শুশ্রূষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ২০০০ সালে মহাস্থবিরের প্রয়ানের পর "ধর্মাধার সেবা কমিটি" "ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি"তে রূপান্তরিত হয়।

প্রতি বৎসর ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি ২৭শে জুলাই মহাস্থবিরের জন্মদিন এবং ৪ঠা নভেম্বর মৃত্যুদিবস পালন করে থাকে। বলা বাহুল্য, নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন ও ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি পরস্পরের পরিপূরক ও সহযোগী সংস্থা। উক্ত সমিতিদ্বয় সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মহাস্থবিরের জন্মদিন উপলক্ষে একটি স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। ২০০৯ সালে প্রথম বক্তৃতাটি দেওয়ার জন্য শান্তিনিকেতনবাসী বিশিষ্ট বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক মহাশয়কে নির্বাচিত করা হয়। "অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধ চেতনা" শীর্ষ বক্তৃতার জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

কলকাতা
২৭শে জুলাই, ২০০৯

ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া
সভাপতি
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

অধ্যাপক সুনীতি কুমার পাঠক বর্তমান ভারতের প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে গবেষণা ও অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত আছেন।

সুনীতিবাবুর জন্ম হয় ১৯২৪ সালের ১লা মে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত মলিহাটি গ্রামে। যদিও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল রাজানগর গ্রামে। তাঁর পিতামাতার নাম ছিল যথাক্রমে প্রবোধ চন্দ্র পাঠক ও শৈবলিনী দেবী। সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ পাশ করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পালিতে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৫০ সালে। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর তিব্বতী বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরে তিব্বতী ভাষা প্রসারের গুরু দায়িত্ব লাভ করেন। আট বৎসর পর তিনি বিশ্বভারতীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৮৯ সাল পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও প্রশাসনের (ছাত্র কল্যাণ আধিকারিক) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবসরের পর তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করে বিবিধপ্রকার গবেষণা কার্যে লিপ্ত আছেন।

অধ্যাপক পাঠক একজন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী ও তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। বিশেষ করে তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞরূপে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিব্বতী ও উল্লেখিত ভাষাসমূহের কোষ গ্রন্থ ও অভিধান প্রণয়ন করে অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন।

এযাবৎ তিনি প্রায় ১৫টি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদনা করেছেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লিখিত দেড় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ সমূহের বিষয়বস্তু ব্যাপক। তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও তিনি মহাযানী বৌদ্ধমত, সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ দর্শন, শিল্পকলা, হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ, প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের বৌদ্ধাচার্যদের জীবন ও কর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও বিশ্বশান্তি ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠের জন্য স্বদেশের ও বিদেশের বহু সেমিনারে এবং কনফারেন্সে তিনি যোগদান করেছেন।

বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য ২০০৭ সালে তাঁর ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে সার্টিফিকেট অব অনার এবং পুরস্কার প্রাপ্তি। আমরা অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব বেঙ্গলী বুদ্ধিষ্টস এবং ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষে তজ্জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধচেতনা

সুনীতিকুমার পাঠক

বৌদ্ধযুক্তিশীলচেতনা

অধুনা বিশ্বায়নের পথে মানুষ যখন চলেছে, তখন বাঙালীর বৌদ্ধচেতনা নিয়ে আলোচনা সঙ্কীর্ণতা বলে মনে হবে। কেননা, রিজিওন্যাল লোকালাইজেশনের বাইরে যাবার জন্যে সবাই উন্মুখ আজ। কিন্তু মানুষের শরীর ও তার মনের ক্ষমতা সীমায় ঘেরা। এই সাধারণ সূত্র মনে রেখে প্রাচীন বৌদ্ধচেতনার উদ্ভব। বৌদ্ধচেতনার কি প্রাচীন ও নবীন ভেদ আছে? সে কথা বৌদ্ধমতের প্রথম সূত্র—যা কিছু কালের সীমায় গঠিত হয়, তার হেতু প্রত্যয় আছে, তা অবশ্য বিনষ্ট হয়।

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগত আহ।
তেসং চ যো নিরোধো এবংবাদী মহাস্সমনো।
(বিনয়পিটক ১/১৭)

অতএব সীমায় ঘেরা মানুষ যতই বিশ্বায়নের বাইরের বাণিজ্যকরণে উদ্যোগ নিতে চলছে ততই মানুষরা তার ভিতরে দীন ও অসহায় হয়ে উঠছে। একথা শুধু যে আজ বৌদ্ধিকজনেরা বোধ করেন তা নয়, সর্বত্র মানুষ তার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পদক্ষেপে অনুভব করছে। প্রাচীন কালেও কিছু জ্ঞানীগুণী সে কথা বুঝেছিলেন।

যেমন ধরুন, ভুসুক পা রাজার ছেলে বাঙালী। অতীশ দীপঙ্কর এখনকার বাংলাদেশের অভিজাত রাজপরিবারের। শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, চন্দ্রগোমী, জিনসেন, কাপট্যবিহারের বোধিবর্মণ, দেবী কোটের মেখলা যোগিনী, দারিক পাদ, গোপীচন্দ্র, সহজযোগিনী চিন্তা (চিঞা), পণ্ডিতবিহারের পণ্ডিত জ্ঞানভদ্র, বনরত্ন প্রভৃতি)

একালেও তেমন অনেকে আছেন, সংঘরাজ সারমেধ, ভিক্ষু জিনসেন, দীপবংশ ভিক্ষু, কৃপাশরণ মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির, প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, ভিক্ষু জিনবোধি, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ধর্মপাল মহাস্থবির, বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির, দর্শনসাগর প্রিয়ানন্দ মহাথের, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির প্রভৃতি। তাঁরা সকলে তাঁদের পরম্পরাগত সমাজচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদর 'বৌদ্ধ' বলে পরিচয় দেন নি। তবে তাঁরা বৌদ্ধ যুক্তিশীল মননে অভিস্নাত হয়েছিলেন। যুক্তিশীল মনন কোন পরিচয় পত্রের বা ইউনিকরমের উর্দির অপেক্ষা রাখে না। সেই উদার যুক্তিশীলতা নিয়ে যুগে যুগে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। বাঙলার কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

'শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে

সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরব করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা।' (এবার ফিরাও মোরে, ২৩/১১/১৩০০ বঙ্গাব্দ)

বৌদ্ধচেতনার নিরুপম নান্দনিক প্রসারের মূলসূত্র 'মৈত্রী' ও 'করুণা'। সেখানে কট্টর যুক্তিবাদ পঙ্গু হয়ে পড়ে। কবির কথায়,

তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। (ঐ)

অতএব ভোগসুখবাদের বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের জোয়ারে মানুষের অন্তরের আর্ত নীরব কান্না। মানুষের শরীর ও মনের ঠিকানায় বাঁধা রয়েছে তা বৌদ্ধ যুক্তিশীল চেতনায়। ঐ যুক্তিশীল মননের ধারা অনুসরণে ভারতে বৌদ্ধচেতনার বিকাশ ঘটে। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। মহাবীর জিনের আবির্ভাবও তেমনি অজায়ব ব্যাপার নয়। যুক্তিশীল মননের সুসংহত পরিণামে ভারতবর্ষের মানুষের এক অভিনব দৃষ্টির সন্ধান পেয়েছিল। প্রায় একই সময়ে মহাবীর জিন ও গৌতমবুদ্ধের বস্তুজগৎ ও তার হেতুপ্রত্যয়ের পরিণামের নবীন অবধারণায় ভারতবর্ষের শ্রমণ সমাজের আবার অভ্যুদয়। ঐ শ্রমণ সমাজ সে সময়ের বৈদিক যজ্ঞনিষ্ঠ ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ সমাজের গ্লানি ও বৈষম্যের যুক্তিশীল প্রতিবাদ।

পালি বিনয় পিটকে সে কথা স্পষ্ট—ব্রহ্মা সহাম্পতি এসে বোধিপ্রাপ্ত গৌতমের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, মগধে আগের ধর্ম অশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সবাই ঐ মলিন অবস্থায় ধর্মকে গ্লানিযুক্ত দেখে চিন্তিত। অতএব আবার সবাই যাতে বিমলবুদ্ধি নিয়ে ধর্ম অনুসরণ করে তাই হে বিজয়ী সংগ্রামী বীর উঠো, লোকসমাজে অনন্য হয়ে বিচরণ করো। জনতা শোকে ও জরায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। অমৃতের দ্বারে উপনীত হও।

পাতুরহোসি মগধেষু পুব্বে ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো।
অপাপুরেতং অমতস্স দ্বারং সুণন্তু ধম্মং বিমলেনানুবুদ্ধং।

সোকাবতিন্নং জনতমপেতসোকো অবেক্খস্সু জাতিং জরাভিভূতং
উট্ঠেহি বীর বিজিতসংগাম সত্থবাহ অনন বিচর লোকে।।
দেসস্সু ভগবা ধম্মং অঞ্ঞাতারো ভবিস্সন্তি।।

(বিনয়পিটক ১/৫)

ভারতবর্ষে যুক্তিশীল মননের ধারা

এশিয়ায় যুক্তিশীল মননের সূত্রপাত অনেক অনেক হাজার বছর আগে ঘটেছিল। তার পরিচয় 'চীনাংশুকে'র ব্যবহার থেকে মিলে। তাছাড়া চিন দেশের মানুষের হাড়ের উপরে চিত্রপ্রতীক লিপিগুলি তার স্বাক্ষর বহন করছে। সে তুলনায় ভারতবর্ষের হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর সিন্ধুকৃষ্টির উপকরণ ভিন্ন ধর্মী। চিনের মানুষেরা নিসর্গপ্রকৃতিকে যেভাবে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছিল, ভারতবর্ষের মানুষেরা সে ধরনের প্রয়োজনে লাগায় নি। সেখানে ছিল দুই মহাদেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিশীল মনন। ভারতবর্ষের মানুষেরা তাদের আশেপাশের প্রকৃতির উপাদানকে নিজস্ব কাজে লাগানোর পাশাপাশি তাদের পরিচয় জানতে প্রয়াস করেছিল—ভারতবর্ষের যুক্তিশীল মননের সূচনা সেখানে ঘটেছিল।

যেমন, দুটো কাঠ ঘষতে ঘষতে আগুনের ফুলকির পরিচয় পেয়ে শুকনো পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালাতে শেখার পাশাপাশি আগুনকে তাদের নিজস্ব করতে চেয়েছিল। শীতের রাতে আগুনের গরমে ঘুমিয়ে যেমন সুখ অনুভব করেছিল, তেমনি মধ্যাহ্নের খরতাপে বহ্নিশিখার লেলিহান জ্বালার সচেতন ছিল। বেদের অগ্নি সূক্তগুলি তার ইঙ্গিত। এমনি করে বস্তুসত্তার অস্তিত্ব আছে কি নাই সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিল। আর সমাধান করেছিল যে, যা দেখি তাই সবটা সত্য নয়। দেখা শোনা জানাও বোঝার বাইরেও একটা সত্য আছে—তাকে বলেছিল তা পরম জানা, পরম বোঝা, পরম জ্ঞান, পরমের বোধ—পরমার্থ, যা চোখে দেখা কানে শোনা সত্যের বাইরে। ভারতবর্ষের যুক্তিশীল মননের গোড়ায় দুই সত্যের জ্ঞান।

গৌতমবুদ্ধের ধর্ম যুক্তিশীল মননের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা হলেও তার প্রতিষ্ঠার জন্যে তখনকার যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের সামনে বারংবার তর্ক বিচারে দাঁড়াতে হয়েছিল। তার পরে বৌদ্ধিকজনেরা তাকে গ্রহণ করেছিল। তাই নিয়ে বৌদ্ধসাহিত্যের উদ্ভব। সেখানে কবি কল্পনার স্থান ছিল না। গৌতম তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায় নিরঙ্কুশ যুক্তিপ্রবণতার উদ্যোগে সমসাময়িক বুদ্ধিনিষ্ঠ সমাজে বৌদ্ধমতকে তুলে ধরে ছিলেন। শুধু বৌদ্ধিক অন্বীক্ষা দিয়েই নিজেকে তুলে ধরা কোনদিন ভারতবর্ষের জীবনশৈলী নয়। নিজের কথার সঙ্গে কাজের বিন্দুমাত্র তফাৎ থাকলে কোনো যুক্তি বিচারের মূল্য ভারতবর্ষে স্বীকৃতি পায়নি। তাই সর্বত্র শীলব্রতে শ্রামণ সমাজের একান্ত নিষ্ঠা। সেখানে জৈন ও বৌদ্ধেরা বেদানুরাগী ব্রাহ্মণদের থেকে ভিন্ন। বৈদিক আশ্রমে সাংগঠনিক শিথিলতা গৌতম বুদ্ধের নজরে বারবার ধরা দিয়েছিল। তাই বৈদিক সাবিত্রী মন্ত্রের প্রশংসা করলেও তার অনুগামীদের শীলব্রতের নিষ্ঠার অভাব দূর করতে "সঙ্ঘ" গড়ে তুলেন। এক বিচিত্র সাংগঠনিক অনুসন্ধান যা অভিনব। ভারতবর্ষের সমাজশাস্ত্রের সংগঠন-বিজ্ঞান তখন থেকে গড়ে উঠেছিল।[১]

সাধারণত সংস্কারকের ভূমিকায় যে-কোন সমাজশাস্ত্রী নিজের এক পৃথক সংগঠন গড়ে তুলে। গৌতম বুদ্ধ রাজপরিবারের সংগঠনের ভিতরে বাল্যকাল কাটালেও ঐ রাজপরিবার বংশানুক্রমিক ছিল না। শুদ্ধোদনকে সম্মতীয় নির্বাচনে মহান নায়কের পদে বসানো হয়েছিল, সেকথা তখনকার গণ-সমাজের এক বিধান ছিল। তাই গৌতম বুদ্ধের গড়া সঙ্ঘের সংগঠন

বিজ্ঞান তখন বৈদিক আশ্রমের সংগঠনের শৈলী থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল।[২] সেকথা, একটি গাথায় স্পষ্ট মিলে, তা এরূপ—যজ্ঞে অগ্নিহোত্র (ব্রাহ্মণেরা) মুখ্য, বেদের মন্ত্রের ছন্দে সাবিত্রী (মন্ত্র) মুখ্য, মানুষের ভিতর রাজা মুখ্য। সাগর নদীগুলির মুখ্য, নক্ষত্রদের ভিতর চন্দ্র মুখ্য, তপনের ভিতর আদিত্য মুখ্য, আকাঙ্ক্ষা শীলদের ভিতর পুণ্য (কর্ম) মুখ্য, (সংগঠনে) সঙ্ঘ মুখ্য সংযোজক। (বিনয় পিটক ৬/২৩)

বৈদিক অগ্নিহোত্রী যজ্ঞে আহুতি প্রদানকারী ব্রাহ্মণদের আশ্রমগুলি বেশির ভাগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। সে কথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ইতিকথা থেকে জানা যায়। শ্রামণদের সঙ্ঘ ছিল গণতান্ত্রিক ধাঁচের। সে পরিচয় বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে স্পষ্ট। তার ফলে বৌদ্ধ ও জৈন সঙ্ঘ সেকালের ভারতবর্ষে যত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পেরেছিল, সেভাবে অত্রির আশ্রম, কণ্বের আশ্রম, বশিষ্ঠের আশ্রম, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বিকাশ লাভ করে নি। এমন কি ঐতিহাসিক যুগে সেই ধরনের শঙ্করাচার্যের আশ্রম বা নিম্বার্ক আশ্রমের বিস্তার ঘটে নি। সেদিক থেকে আশ্রমের কৃষ্টি সঙ্ঘের বিকাশশীল সংস্কৃতির তুলনায় ব্যাপক ছিল না। তার ফলে ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞানে দুটি সংস্কৃতির ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল। তা ভৌতিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন ছিল, তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্তির দিকে দেখা দেয়। এইভাবে ব্যক্তিজীবনের অভ্যুদয় ব্রাহ্মণ কৃষ্টির অধিকতর উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের বুদ্ধের সমকালীন জীবনধারাকে পদে পদে বাধা দিয়েছিল। মহাবীর জিন ও গৌতম বুদ্ধ বিশেষ করে সেই বাধা দূর করে সমাজজীবনে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দুই ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। জৈন মতে বহুজনিক ব্যক্তির একক অস্তিত্বকে নস্যাৎ না করে শ্রাবক সঙ্ঘ ও শ্রাবিকা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা পায়। বৌদ্ধ সঙ্ঘে তার বিপরীত ঘটে। ব্যক্তি সেখানে দলের একক্ত্ব পায়। সেখানে 'বুদ্ধবাদ' গৌতমবুদ্ধের প্রতিবাদী পক্ষের অভিযোগের বিষয় হয়ে ওঠে। অথচ গৌতম নিজে তাঁর চিন্তাধারা ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়-কৌশলকে এক কথায় 'সদ্ধর্ম' বলেছেন।

ভারতবর্ষের সমাজধারায় গৌতম বুদ্ধের সদ্ধর্মের বিকাশ যুক্তিশীল মননের এক অভিনব পদক্ষেপ।[৩] সেখানে যুক্তিশীল মননের সীমা ব্যক্তি থেকে সামাজিক হয়ে উঠেছিল। এখনকার ভাষায় পারসোন্যাল রেসপনসিবিলিটি, কালেক্‌টিভ রেসপনসিবিলিটিতে রূপ নিয়েছিল। তার মূলে ছিল তখনকার ভারতবর্ষের প্রশাসনিক অর্থব্যবস্থার দুটি ভিন্ন স্রোত। গ্রামগুলি গ্রামণীর হাতে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় নির্ভর করত। অথচ 'বিশ' তথা সমষ্টিভূত গ্রামগুলির আর্থপ্রশাসন সর্বত্র বিশাংপতির হাতে ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামণীকে 'সম্মতিকায়' অনুসারে আর্থসামাজিক প্রশাসনে নির্ভর করত। এইভাবে 'গণ' এক একটি সংস্থান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক জনেরা একক্ জনগোষ্ঠী ছিল না। সেখানে 'পঞ্চজনা'·'পঞ্চকৃটয়' 'পঞ্চক্ষিতিযঃ' শব্দগুলির পাশাপাশি গণ ও রাজন্য শব্দগুলি প্রসঙ্গত প্রয়োগ করা হয়েছে। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে একদিকে যেমন মগধের বংশানুক্রমিক রাজন্য প্রথা চলেছে। তেমনি লিচ্ছবি, কোলিয়, বৃজিদের 'গণশাসন'

প্রথা। নরেন্দ্রনাথ লাহার লেখা প্রাচীন ভারতবর্ষের গণশাসনের ভূমিকা বইটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। গৌতমবুদ্ধের একটি উক্তি এরূপ—গঙ্গা, শোন, অচিরবর্তী যেমন সাগরে উপনীত হলে এক হয়, তেমনি সঙ্ঘে ব্যক্তির পরিচয় এক। সঙ্ঘে ছিল তখন এক সমবায়ের চেতনা—কেননা তখনও সঙ্ঘে 'সংকায়'-ভেদ ঘটার সুযোগ ঘটেনি। চুল্লবগ্গে ও কোশাম্বকসুত্তে সংঘভেদককর্ম্মকে নিন্দা করা হয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষের যুক্তিশীল মনন কেবল অধ্যাত্ম চেতনায় ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানের একাত্মক চিন্তায় নিবদ্ধ ছিল না। ভৌতিক প্রপঞ্চকে তারা উপেক্ষা করে নি। তাই 'সমবায়' শব্দটি সঙ্ঘের মত একটি প্রাচীন প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে মিলে। বৈদিক সাহিত্য যেমন এক সময় মৌখিক আবৃত্তির উপর নির্ভর করে 'শ্রুতি' আখ্যা পেয়েছিল, বৌদ্ধ সাহিত্য সিংহলে লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে অবধি শ্রবণ পরম্পরায় সঙ্ঘে বারংবার আবৃত্তি করা হোত। সেভাবে ধর্মধর, বা সূত্তভানক, বিনয়ধর শব্দগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচলিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধের কাছে ভদন্ত আনন্দের প্রশ্নের উত্তর মহাপরিনিব্বাণসুত্তে স্পষ্ট।—আনন্দ প্রশ্ন রেখেছিলেন। 'অতঃপর সঙ্ঘের ভার কে নেবেন'? গৌতম বুদ্ধের সদুত্তর—'ধর্ম ও বিনয়ের দেশনা।'

কেননা, সংগঠন বিজ্ঞানের মতে ব্যক্তির সীমা সীমিত। সংবিধানের বিধায়ক প্রযোগ সীমার অতীত— কালের অতীত; তবে সংগঠনের নিয়ামক শক্তি সংগঠিত থাকবে। তবু গৌতম বুদ্ধের অজানা ছিল না যে কোন সংগঠন চিরদিন চলতে পারে না। সেই বিচার নিয়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অনুনয় স্বীকার করলেও বুদ্ধের অমোঘ উক্তি ছিল—'সঙ্ঘের আয়ু অর্ধেক হয়ে গেল।' কেননা, সংগঠনও হেতুপ্রত্যয়ের পরিণামে সংগঠিত হয়, অতএব তা ক্ষয়-ধর্মী। তা নিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবিরা নানান যুক্তিতক্কো করে চলেছেন। সেই বাদবিচারের উপাদান ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় আজও ভাস্বর—যা এখনকার মানুষদের কাছে বিস্ময়কর। কী দুরন্ত সাঙ্ঘিক সংগঠন শক্তির বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগ ঘটেছিল। তাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা অবধি ভারতবর্ষের প্রত্নসম্পদের পরাকাষ্ঠায় বৌদ্ধ উপাদান অনন্য। একসময় ভারতবর্ষে এমন কোন অংশ ছিল না যেখানে বৌদ্ধদের সাঙ্ঘিক সংগঠন সক্রিয় ছিল না। সেখানের ব্যক্তির পরিচয় কোথাও মিলে, কোথাও বা মিলে না। তাতে ভারতবর্ষের মানুষের কিছু আসে যায় না—তারা জানে, ব্যক্তির আয়ু, গোষ্ঠীর কার্যক্ষমতার সীমারেখা আছে, কিন্তু পাথরের অস্তিত্ব, ধাতুর যৌগিকতার পরিমাপ মানুষের আয়ুর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাই পাথরের গায়ে শিলালেখ, তাম্রফলক, ধাতব শিল্পে মূর্তি ধরে রেখেছে তাদের অনতিক্রম্য মননসম্পদ ও নান্দনিক চারুতা।

এতবড় বিশাল ভারতবর্ষ আজ দুর্ভাগ্যের বশে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। তবুও বৌদ্ধদের সারা ভারতবর্ষে ব্যাপক বিকাশের যে প্রত্নসম্পদ আজ অবধি পাওয়া গেছে, তার সম্যক পরিচয় সর্বতোভাবে মেলে নি। মহাপরিনির্বাণের পর ধীরে ধীরে বৌদ্ধসঙ্ঘ নানা ভাবে শাখাপ্রশাখায় বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। তা নিয়ে বৌদ্ধেরা কখনো ভেঙে পড়েনি। কেন না,

যুক্তিনিষ্ঠ মনে কোনো বিষয় বা বস্তুর জ্ঞান একমুখীন হতে পারে না। সে কথা ভারতবর্ষের মানুষেরা সব সময় মেনে চলেছে—'নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্'। জ্ঞানের বিকাশ কোনো সময় সমকৌণিক নয়। অতএব মগধের বৌদ্ধেরা বুদ্ধের বচন একভাবে বুঝতে পেরেছিল, কৌশাম্বীর বৌদ্ধেরা সে বুদ্ধবচনকে ভিন্নভাবে বুঝতে চেয়েছিল। একই গুরুর শিষ্যেরা সমানভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারে না—সেখানে বৌদ্ধেরা উদার ভাবে যুক্তিনিষ্ঠ। যুক্তিশীল মনের বৌদ্ধেরা যখন নানা স্থানের মানুষদের কাছে তাদের ভাবনায় বুদ্ধবচনের সূত্রগুলি প্রচার প্রসার করতে লাগল, তখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের দৃষ্টিতে বৌদ্ধমতের সামাজিক বিন্যাস বহুভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়েছিল। গড়ে পৃথক পৃথক নিকায়গুলি।

তাই বৌদ্ধেরা বিষম অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল রাজা অশোক ও হর্ষবর্ধনের আমলে। রাজন্যশক্তি সক্রিয়ভাবে স্থানীয় বৌদ্ধিক চিন্তাগুলিকে রাজনীতির বিস্তারে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। সারা ভারতবর্ষে বৌদ্ধিক চেতনা খৃষ্টপূর্ব যুগে আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষে পদার্পণের পর এক অভূতপূর্ব সন্ধিসংযোগের সন্ধান পেয়েছিল। তার কিছুদিন পরে মধ্য এশিয়ার ইউ.চি. তথা কুষাণেরা এসে সরাসরি বৌদ্ধমতকে আশ্রয় করেছিল। রাজা অশোক তাঁর দূরদর্শিতায় বৌদ্ধ শ্রামণ সমাজকে সামনে রেখে নিজেকে একচ্ছত্র আধিপত্য অনায়াসে বিস্তার করেছিলেন। তিনি তরবারি দিয়ে মানুষের শারীরিক নির্যাতনের বিনিময়ে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতায় দেশবিদেশের মানুষকে অন্তরের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রসার শুধু ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক বিকাশে সহায়ক ছিল না। এমন কি, পশ্চিম-উত্তর ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধমত এক অভিনব অভ্যুদয়ের সূচনা করেছিল। আরও বৌদ্ধদের মননধর্মিতা এক নূতন পদক্ষেপে এগিয়ে গেছল।

সেই পথ ধরে কুষাণেরা শুধু নয় পরবর্তী কালে বহিরাগত জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতকে আশ্রয় করে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। বৌদ্ধেরাও নিজেদের সেই সময়ের ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক বুদ্ধিনিষ্ঠার উপর নিজেদের অস্তিত্বের প্রসার ঘটিয়েছিল। হর্ষবর্ধনের সময় বৌদ্ধেরা এক নূতন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছিল। তা হোল ভারতবর্ষের বৌদ্ধবিদ্যার পূর্ব এশিয়ায় প্রসারের ফলে এশিয়া জোড়া বৌদ্ধমতের ক্ষমতাহীন বিস্তার। এশিয়ার রাজশক্তিতে বৌদ্ধদের যোগদান ঘটেছে। মগধের রাজা অশোকের মত কনৌজের হর্ষবর্ধনও উচ্চাভিলাষী পরাক্রমী বুদ্ধিমান শাসক ছিলেন। তাঁরা দুজনেই বৌদ্ধ শুধু নয় জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের জনসমুদয়কে স্বাধিকারে আনার প্রয়াসী ছিলেন। সাধারণ জনতার আর্থসামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক চেতনার উন্নয়নে প্রয়াসী হন।

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ বৌদ্ধিক সমাজের ব্যবধান যুগে যুগে চলে এসছে। ভারতবর্ষের ভাষায় তাকে এক ব্যাপক অর্থে 'ধর্ম' শব্দের উদার দ্যোতনায় ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে রাজধর্ম, আশ্রমধর্ম, গৃহি-ধর্ম, সমাজ-ধর্ম, জীবিকা-ধর্ম, জৈব-ধর্ম, পশু-ধর্ম মনুষ্য-ধর্ম মনুষ্যেতর-ধর্ম, সুরধর্ম, অসুরধর্ম, বণিকধর্ম আরো কতো না গোনা হয়েছে। প্রত্যেকের ধর্মের ব্যবহার-নীতি বা এথিকস ভিন্ন। সেই ধর্ম-বিমিশ্রণের ফলে

ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন এশিয়ার আর পাঁচটি দেশের থেকে ভিন্ন। বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে এশিয়ায় প্রায় সর্বত্র যাওয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানাধরনের সমাজের ধারা ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি সমবায় গড়ে তুলতে পেরেছে। হর্ষবর্ধন সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। হিউ এন সঙের ভারতবর্ষে আসার একটি ছোট ঘটনায় তা বোঝা যায়।

চিনের প্রবীন বিদ্বান ভারতবর্ষের পথে পা বাড়িয়েছেন। খবরটা অসমের বৌদ্ধ রাজা জানতে পারেন। স্বভাবধর্মেই রাজা ঐ বিদ্বান পরিব্রাজককে তাঁর প্রজাবর্গের কল্যাণে আমন্ত্রণ জানান। সংবাদটি হর্ষবর্ধনের কানে যায়। কামরূপের রাজা হর্ষবর্ধনের পদানত না হলেও সখ্য সূত্রে দায়বদ্ধ ছিলেন। হর্ষবর্ধন পত্র লিখে অনুরোধ জানান যে চিনের বিদ্বানের আগমনে তিনি উৎসাহিত। তবে তার শাসনাধিকারে কামরূপে তাঁকে না স্বাগত জানিয়ে পাটলিপুত্রে পরদেশী অভ্যাগতের অভ্যর্থনা সমীচীন ছিল।

উত্তরপূর্ব অপরাস্তকের রাজন্য প্রথমে একটু নারাজ ভাব দেখালেও হর্ষবর্ধনের বুদ্ধিমত্তায় ও কৌশলী অভিজ্ঞতায় তিনি নতিস্বীকার করে চিনের অভিযাত্রী হিউ এন সঙ্‌কে পাটলিপুত্রে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন।

শুধু অশোক ও হর্ষবর্ধনের মত উদার বিচক্ষণ কুশলী রাজনীতিক নন, প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন মহাজনপদের যুগ থেকে বাঙলার পালযুগ ও সেন রাজাদের আমলে অবাধ রাজকীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমকালীন সাধু সন্ন্যাসীদের সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠতা নিবিড় ছিল। সে কথা প্রাচীন ভারতবর্ষের মহাকাব্যে থেকে শুরু করে অর্বাচীন সাহিত্যে প্রসঙ্গত এসেছে। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে ধর্মের তত্ত্ব গুহাসীন, বা বোঝা কঠিন, অতএব মহাজনেরা যে পথে চলেছেন, তা অনুসরণ করো।' টীকাকার নীলকণ্ঠ (আনুমানিক খৃঃ ৫ম শতক) ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'মহাজন' বলতে 'বহুজন'। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বহুজনিক।

ভারতবর্ষের ভাষায় 'মহা' শব্দের তাৎপর্য বহুমুখীন। তা সব ক্ষেত্রে ইংরাজী 'গ্রেট' শব্দে বাঁধা নয়। 'মহা' বলতে বহু, উচ্চ, অনুত্তর, ঋদ্ধ প্রভৃত, অনমনীয়, তুরীয় বোঝায়। সেদিক থেকে বৌদ্ধেরা মহাযান শব্দটি 'উদার' অর্থে প্রয়োগ করেছে। মহাযানবিংশকে নাগার্জুন তা স্পষ্ট করেছেন, পরে অসঙ্গ মহাযান উত্তরতন্ত্রেও মহা শব্দের অর্থব্যাপ্তি প্রকট করেছেন। অধুনা 'হীন' শব্দের অর্থের অসঙ্গতি অনুদারতার ইঙ্গিতবহ। হীন শব্দের আভিধানিক অর্থ নীচ, সর্বত্র প্রযুজ্য নয়। 'হীন' শব্দের অপর অর্থ সীমাবদ্ধ বা সীমিত ব্যাপ্তির। হীনযান শব্দটির ব্যবহার অসঙ্গের উত্তরকালে যোগাচারের চৈতসিক ব্যাপ্তির সীমিত অর্থে সামান্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইংরাজী তর্জমায় তা 'লোয়ার' ও 'লেসর' অর্থে ব্যবহারের ফলে শব্দের অর্থাপত্তির সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় বাঙালীর বৌদ্ধ চেতনা

প্রাচীন বাংলা বলতে পাণিনির উল্লিখিত ''গৌড়পুর'' বোঝায় কিনা তা বিবাদাস্পদ। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড় দেশের স্থানীয় কৃষিজাত শিল্প গুড় উৎপাদনের প্রসঙ্গ প্রায়

সকলে স্বীকার করেছেন। 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' শব্দ নিয়েও বিদগ্ধজনেরা সর্বত্র একমত নন। মনুসংহিতায় (আনু খৃঃ পূঃ ২০০-২০০ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গদেশকে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। এখানে ঐ বিতর্ক নিরর্থক। তখন 'আর্যাবর্ত' বলতে বেদ-অনুসৃত 'পঞ্চনদ' মাত্র। গঙ্গানদী ও তার শাখানদী এবং উপনদী বিধৌত বিস্তৃত পূর্বভারতের ভূখণ্ড বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সাধারণভাবে বঙ্গ বা বঙ্গাল দেশ নামে পরিচিত। তার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ভূগঠন থাকার ফলে লাট/রাঢ় বা সুহ্ম এক প্রাচীন পরিচয়। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা মগধে ও বৈশালীর থেকে বেশি দূরে না থাকলেও বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে সম্পর্ক কি করে ঘটেছে তা নিয়ে সকলে একমত নন। বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে মহাস্থান গড়ের শিলালেখ একটি স্বীকৃত প্রমাণ। তা নিয়ে এখানে আলোচনার অবসর কম।

প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা বৌদ্ধচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কেমন করে সেকথা সুমাগধা অবদানের কাহিনী ও বৌদ্ধ সংস্কৃতে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্ব-অবদান-কল্পলতায় ইংগিত করা হয়েছে। অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুমাগধা পুন্ড্রবর্ধনের এক বণিক পুত্রকে বিবাহ করেন। তিনি পুন্ড্রবর্ধনে এসে ভগবান বুদ্ধের শিক্ষাপদ প্রসার করেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিরূপন করা কঠিন। অপরদিকে তারনাথ তাঁর তিব্বতী ভাষায় লেখা 'ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম' (গ্যগর ছোরজ্যু) গ্রন্থে যে কাহিনী দিয়েছেন তা এরূপ—

পুষ্যমিত্রের প্রভাবে বৌদ্ধেরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অপরান্তক ভারতবর্ষে চন্দ্রবংশের সহায়ক ছিলেন বলে কঠোরভাবে তাদের নিগৃহীত হতে হয়েছিল। ঐ ঘটনা মহাপরিনির্বাণের প্রায় পাঁচশত বছর পরে ঘটেছিল, তেমনি নাকি ভগবান বুদ্ধের ভবিষ্য বাণী ছিল। উত্তরদেশে তখন বৌদ্ধমতের অবক্ষয় ঘটলেও নাগার্জুন শ্রীপর্বতে অবস্থান কালে পুনশ্চ বুদ্ধমতের প্রসার করেন। তারপর মগধে ফণিচন্দ্রের রাজত্বকালে পূর্বভারতবর্ষে গৌড় বঙ্গালের রাজা গৌড়বর্ধন মগধের বিনষ্ট বৌদ্ধ মঠগুলির সংস্কার করেন। তারও পরে বংশচন্দ্র গৌড় বঙ্গালে বৌদ্ধমত প্রসারের উদ্যোগী হলে কাশীজাত (?) নামে এক ব্রাহ্মণ বঙ্গালের 'স্ব-ন-র-গ-বো' বুদ্ধবন্দনার সূত্রপাত করেন। (ওয়াটার্সের মতে ঢাকার প্রাচীন নাম সোনাগাও, একথা লামা জিন পা ও অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অনুদিত গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন।)[৪]

অনেকের মতে নাগার্জুনের জীবনের কিছুকাল নালন্দায় কেটেছিল। বু-তোন একথা বললেও সুম্‌পাখনপো তেমন কোন উল্লেখ করেননি। চীনাস্রোতেও নাগার্জুনের জীবনী সে বিষয়ে নীরব।[৫] সেক্ষেত্রে নালন্দা বিহারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তারনাথের উপরের বিবরণের যথার্থতা নিঃসংশয়ে ধরা কঠিন। তবে নালন্দায় তখন শ্রাবকযানীয় বৌদ্ধবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বংশচন্দ্রের উদ্যোগে গৌড়বঙ্গে যে পরম্পরায় বৌদ্ধমতের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তা শ্রাবকযানীয়। তা পালি ভাষায় না বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষায় তা প্রচলিত ছিল আজ নির্ণয় করা কঠিন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে চন্দ্রবংশ পূর্ববঙ্গে খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে কুমিল্লা ও রাঘবগঞ্জের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপের শাসন অধিকারে ছিল।[৬] মহারাজাধিরাজ

ত্রৈলোক্যচন্দ্র ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি গৌড়রাজকে পরাজিত করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীচন্দ্র (আনুমানিক ৯০৫-৯৫৫ খৃঃ) গৌড় ও কামরূপের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে গোপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভবত গোপাল পালবংশের দ্বিতীয় গোপাল। তবে দীনেশ চন্দ্র সরকার চন্দ্রদ্বীপের বৌদ্ধতারা প্রতিমা বাঙালী বৌদ্ধ বৈয়াকরণ চান্দ্রব্যাকরণের রচয়িতা চন্দ্রগোমীর উপাস্য দেবী ছিলেন বলে অনুমান করেন। সে দিক থেকে চন্দ্রদ্বীপের প্রতিষ্ঠা গুপ্তযুগেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাঁর মতে "দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় পালবংশীয় ধর্মপাল ও চন্দ্রবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রের বর্ণনা এবং আইন-ই-আকবরী'র সাক্ষ্য হইতে মনে হয় চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলের অন্য নাম ছিল বঙ্গাল দেশ।' নালন্দা মহাবিহারে উপাসক চন্দ্রগোমীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বিদগ্ধ মাধ্যমিক দার্শনিক ভিক্ষু চন্দ্রকীর্তির শাস্ত্রবিচারের ঘটনা তিব্বতী স্রোতে পগ সম জোঙ্ সঙে বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৭] সেদিক থেকে তারনাথের বংশচন্দ্রের উল্লেখ মগধের এক প্রাচীন প্রশাসক রাজ বংশ সম্ভবত গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠার (?) পূর্বে গড়ে উঠেছিল। গুপ্তযুগের সময় নালন্দা মহাবিহারে বোধিসত্ত্বযানের বিকাশ ঘটে। আরও বোধিসত্ত্বের লোককল্যাণের উপযোগী 'পারমিতা নয়' ও 'মন্ত্র নয়' গুপ্তযুগের আগে বাঙালী বৌদ্ধেরা গ্রহণ করেছিল।[৮]

তারনাথের মতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের আমলে বৌদ্ধ নিগ্রহের বিবরণে এবং বাংলায় বৌদ্ধমতের প্রসারের কথা মেনে নিয়ে খৃষ্টপূর্ব যুগে সম্ভবত দ্বিতীয় শতকে বাঙালীরা বৌদ্ধচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তারনাথের বিবরণে আরো উল্লেখ মিলে যে, কাশী-জাত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধমতে অনুরাগী ছিলেন। সে বিবরণে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর সমকালীন যুক্তিশীল মননের অধিকারী বহু ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্বেচ্ছায় উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন।[৯] ঐ বিবরণে আরও বলা হয়েছে পূর্বতন বৌদ্ধ স্থানগুলি পুনরায় সংস্কার করা হয়েছিল। তার সত্যতা গ্রহণ করলে নালন্দা প্রতিষ্ঠার সময়কাল শুঙ্গপূর্ব যুগে ছিল। তা অন্যত্র আলোচ্য।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ প্রতিমার ব্যাপকতা

দুই বাংলা ভাগ হওয়ার অগে যে কয়েকটি মিউজিয়াম বা প্রত্নসম্পদশালা গড়ে উঠেছিল তাদের সব জায়গায় বৌদ্ধপ্রতিমার ছড়াছড়ি। বাঙালীর যুক্তিশীল মনে মূর্তিপূজার ব্যাপকতা অনেকের কাছে বৌদ্ধমতের একটি স্ববিরোধী তথ্য। পালি ভাষায় বৌদ্ধমতের যে-পরিচয় বাঙালীদের কাছে ঊনবিংশ শতক থেকে প্রচারিত হয়েছিল সেখানে তা মুখ্যত ত্রিমুখী শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা (পালিতে সীল-সমাধি পঞা)। সেখানে মূর্তি গঠনের প্রশ্ন ছিল না। এমন কি, গৌতম বুদ্ধ বারবার বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষাপদ যুক্তিবিচারের কষ্টি পাথরে ঘসে মেজে আগুনে পরখ করে গ্রহণ করবে। সেখানে শ্রদ্ধা তথা বিশ্বাসের সম্ভাবনা নিতান্ত কম।

তবে বৌদ্ধচেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রাচীন বাঙালী চন্দ্রগোমীর মত বিদ্বানও বৌদ্ধতারার সাধনায় নিমগ্ন হন। সেকথা পরম্পরা অনুসারে স্বীকৃত। বৌদ্ধ মতে হেতু ও ফলের দ্বারা যে-কোন

বস্তু ও বিষয় গঠিত হয়। বাঙালী বৌদ্ধেরা মূর্তি উপাসনা কেমন করে স্বীকরণ করেছিলেন তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধ উপাসনার গোড়া ধম্মপদে দেখা যায়। বিদগ্ধজনেরা ধম্মপদের সঙ্কলনের পর্ব বিভাজন করে থাকেন। উপাসক উপাসিকা ও ভিক্ষু ভিক্ষুনীর ক্ষেত্রে 'শরণগমন' অবশ্য করণীয়। সেখানে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ শরণ্য হয়ে উঠেছে। শুধু সেখানে সদ্ধর্মের শীলধর্ম সীমিত নয়। বুদ্ধের জীবিতকালে বুদ্ধকে যখন তৃষিত ভবনে যেতে হয়েছিল তখন অনেকের কাছে বুদ্ধের প্রতিমার প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। গৌতম বুদ্ধ এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। তিনি অনুরাগীদের সামনে পঞ্চস্কন্ধের জ্যামিতিক মাপক চিত্রায়ন করে দেন। মহাপরিনির্বাণের পর তা স্তূপ তথা চৈত্যগঠনের প্রতীক-অবয়ব হিসাবে মর্যাদা পায়।[১০] ঐ পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক পরে ধর্মধাতুর রূপায়নে বিকাশ লাভ করে। তাই দেশে দেশে স্তূপনির্মাণে বৌদ্ধ প্রতীক শিল্পের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তেমনি করে আটটি 'অর' (ইংরাজী স্পোক) দিয়ে বৃত্তাকারে ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রতীক গড়ে ওঠে। আবার বহু অর দিয়ে 'সঙ্ঘ-সমবায়' প্রতীকভূত হয়।

মানব প্রতিমায় বুদ্ধকে সম্ভবত মৌর্যযুগে চিত্রিত করার প্রয়াস সাধারণের ভিতর জেগে ছিল। অনেকের মতে তা গান্ধারে গ্রীক শিল্পের অনুসরণ। তবে পালিতে রূপবন্নপ্পমান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বুদ্ধের জীবিতকালে সেই প্রয়াস ঘটে ছিল। বলা বাহুল্য চিত্রকলায় মানবপ্রতিমা বুদ্ধের সমকালীন চিত্রশিল্পীদের অজানা ছিল না। ভাস্কর্যও মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্ন অবশেষে পাওয়া গেছে। বৈদিক সংস্কৃতিতে কাঠের প্রতিমায় মানুষের মূর্তি করা যাজ্ঞিকদের ভিতর প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদের ভিতর বুদ্ধপ্রতিমা ছাড়াও অগণিত মানবাকার মূর্তি গড়ার পিছনে ধ্যানসমাধিতে অনুভূত প্রতিভাসের ইঙ্গিত রয়েছে। তার চারটি অবস্থা এরূপ—

(ক) প্রতিদিন ধ্যান করতে করতে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। ঐ পরিশুদ্ধ চিত্তে ক্রমে ক্রমে সংস্কার ও বিকল্পের লোপ ঘটে। শূন্যতার বোধ আসে।

(খ) ঐ শূন্যতার-বোধি লাভ হলে আবলম্বন শূন্য চিত্তের মন্ত্রবীজের সঙ্গে সংযোগ ঘটে। মন্ত্র চিত্ত ও মনের সংযোজক স্পন্দন যা শরীরের ভিতর নিয়মিত তরঙ্গ তুলে চলেছে। ধ্যান সমাধিতে শমথ চিত্তের মন্ত্রবীজের সংযোগ ঘটে।

(গ) চিত্রকর যেমন পরিচ্ছন্ন পটের উপর তুলির টানে টানে অবয়বর আঁচড় আনে, তেমনি ধ্যান সমাহিত পরিশোধিত চিত্তের স্ফটিকের স্বচ্ছতায় উপর মন্ত্রের দ্যোতনায় তরঙ্গায়িত বিম্বের প্রতিভাস ভেসে ওঠে। তা সাবলীল। ঐ বিম্বনিষ্পত্তির বস্তুস্থিতি থাকে না অথচ স্পন্দনের আভাস ধ্যানসমাধিতে প্রকাশ পায়।

(ঘ) ধ্যানীর ঐ বিম্বনিষ্পত্তি থেকে পরিনিষ্পন্ন আকার অবয়বী হয়ে ওঠে— সাধারণভাবে যোগিপ্রত্যক্ষের সংবেদনে তা আকার পরিগ্রহ করে যার বস্তুসত্তা থাকে না। কেবল আনন্দরসে অভিসিক্ত বিশ্বের প্রতিভাস অনুভব জাগে। পরে যোগি প্রত্যক্ষের অবয়বী আকার চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের কলাসম্ভারে দেবদেবীর প্রতিমার রূপ গড়ে তোলা হয়। তা

উত্তরকালে সাধারণভাবে মূর্তি বা প্রতিমা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে সাধনমালার একটি শ্লোক স্পষ্ট—

প্রথমং শূন্যতাবোধিং দ্বিতীয়ং বীজসংযুতম্।
তৃতীয়ং বিম্বনিষ্পত্তিং চতুর্থং ন্যাসমক্ষরম্।।

(সাধনমালা ১৬৮, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত)

এখানে 'ন্যাসমক্ষরম' সাধক যোগীর সিদ্ধির উপায়। নিজের দেহের প্রতি অঙ্গ মন্ত্রের অক্ষর ন্যাসের দ্বারা পরিশোধন করলে শূন্যতার উজাগরতায় দ্যুতিমান হয়ে উঠে। সিদ্ধাচার্য সেখানে পরিশোধিত দেহকে উপায় বলে বোধ করেন। তা প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। বাঙালী ভুসুকপা বলেছেন, 'প্রভাতে জেগে উঠি, রাতে মরে যাই। দেহের মাংস না স্পর্শ করেই ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করে।'

জীয়ন্তে ভেলা বিহণি, মএল রঅণি।
গহন বিণু মাংস ভুসুকু পদ্মবন পইসহিলি।।

(চর্যাগীতিকাল প্রবোধচন্দ্র বাগচী
সম্পাদিত সং পৃঃ ৭৮ বিশ্বভারতী)

তিব্বতী অনুবাদে অর্থের পরিবর্তন দেখা যায়। জীয়ন্ত থাকলে ছাড়ে না, মরে গেলে ছোঁয় না। মাংস (বস্তু অস্তিত্ব?) ছাড়াই ভুসুক সে ঘরে প্রবেশ করে।

যুক্তিশীল মনে ধ্যানসমাধি যোগের স্থান

রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির সমাবেশে মহাকাশ্যপ 'অভিধম্ম' ব্যাখ্যান করেছিলেন। এই পরম্পরায় সুত্ত ও বিনয়ের আবৃত্তির পর তাদের ভিতর চৈতসিক মহত্ত্ব বোঝাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মহাকাশ্যপ সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেননা, ধম্মপদে গৌতমবুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন বুদ্ধদের শিক্ষাপদ তিনটি,—

(ক) সকল পাপ (অনুশোচনার যোগ্য) কর্ম থেকে বিরত হওয়া;
(খ) কুশল (কল্যাণকর) কাজে নিয়োজিত করা;
(গ) নিজের চিত্তকে ধৌত করে পরিশুদ্ধ করা।[১১]

বৌদ্ধ যুক্তিশীলতার মূল কথা হোল, অপরিশুদ্ধ চিত্তে বিজ্ঞানের ক্লেশযুক্ত মলিনতা থাকার ফলে মিথ্যা যুক্তির অনুসরণ মিথ্যাদৃষ্টিতে আবৃত থাকে। চিত্তে ক্লেশের আবরণ থাকলে সত্যদৃষ্টি লাভ করা যায় না। মহাকাশ্যপ সেভাবে ব্যক্তিমাত্রের চিত্তের পরিশুদ্ধি কেমন করে করা যেতে পারে যে-ব্যাখ্যান দেন, তা অভিধম্ম পিটক নামে পরিচিত। পরে সর্বাস্তিবাদী সারীপুত্র, মৌদগলায়ন প্রভৃতি বুদ্ধ শিষ্যেরা ঐ ব্যাখ্যার বিস্তার করেন।

'চিত্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হোল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান সংগ্রহ করা। তার ফলে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বাইরের বস্তুর জ্ঞান এবং বিষয়ের জ্ঞান সব সময় চিত্তের মণি কুঠুরীতে জমা হতে চলেছে। অতএব চিত্ত তার স্বভাবগত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছতা হারিয়ে

ফেলে। বিষয় বা বস্তুর প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ, আদি নিহিত সংস্কার বশে চিত্তকে ক্লেশযুক্ত করে। তার থেকে পরিনির্মল করতে শমথ বিপশ্যনা ছাড়াও ধ্যানের পথে সমাধিতে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করতে লাগে। তা না হলে চিত্তের সংস্কারের জমে-ওঠা ময়লা পরিশোধন করা যায় না। ঐ পরিশীলিত চিত্ত ক্রমে ক্রমে রাগ দ্বেষ ও মোহের জাল কাটিয়ে উচ্চতর রূপ ও অরূপ ধ্যানের স্তরে স্তরে অগ্রসর হতে থাকে। ঐ সময় ধ্যানস্থ ব্যক্তি পরিশীলিত চিত্তে অরূপের পরিচয় ঘটে। তখন তার যুক্তিশীল মননের ক্ষমতা নিঃসংশয়ে অমলিন ও উদার হয়ে ওঠে। মনও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবনায় সমর্থ হয়।

ধ্যান ও যোগ বললে সাধারণত চোখ বুজে পদ্মাসনে, সুখাসনে বা বীরাসনে বসে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে দম আটকানো প্রভৃতি বোঝার ফলে অনেক বুদ্ধিজীবির কাছে তা আজগুবি ঠেকে। বস্তুত, বৌদ্ধমতে শমথ ও বিপশ্যনা তথা বিদর্শন ভাবনা মননের একাগ্রীকরণ। তা মজিঝম নিকায়ের সতিপটঠান সুত্তে[১২] স্পষ্ট করা হয়েছে। মানুষের দেহ কায়। নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গড়া। তাদের পৃথক পৃথক ক্রিয়াশীলতা থাকলেও সাধারণভাবে সবাই সবাইএর সঙ্গে সমবায়যোগে চলেছে। কায়তন্ত্রের এই সমবায় নীতির উপরে বৌদ্ধ সংগঠনের নীতি অধিষ্ঠিত। অতএব কায়ের ভিতর প্রত্যেক অঙ্গের গতি, স্পন্দন ও ক্রিয়াশীলতাকে দেখাই 'কায়ানুপশ্যনা'। তেমনি করে তাদের সংবেদনার গতি, স্পন্দন ও ক্রিয়াশীলতাকে ক্ষণে ক্ষণে দেখাই 'বেদনানুপশ্যনা'। এবার আরেক ধাপ এগিয়ে চিত্তের প্রতিক্ষণের গতি স্পন্দন ও চঞ্চলতাকে দেখতে যুক্তিশীল মনের বাধা নেই। ধীরে ধীরে যুক্তিশীল চঞ্চল মনের একাগ্রীকরণ ঘটতে থাকে। 'চিত্তে চিত্তানুপশ্যনা'। আর একটু আগে বললে এই ভৌতিক বস্তুজগতের সব কিছুর গতি ও ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নজরে আসতে থাকে। তা ধর্মানুপশ্যনা। যুক্তিশীল মনে অনেক ক্ষেত্রে অধীর হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যায়। সেখানে ধীর ভাবে না এগোতে পারলে প্রথম ধ্যানের যৌক্তিকতা আজগুবি ঠেকে। তারও আগে ওঠা তে দূর-অস্ত।

সৌভাগ্যের কথা, প্রাচীনকাল থেকেই একদল বাঙালী এই অন্তর্মুখীনতার পথে এগিয়ে ছিলেন, তাই বাংলার মাটীতে বহু বড় বড় নৈয়ায়িক, ভৌত বিজ্ঞানী ও গভীর ধ্যানশীল মানুষের আবির্ভাব ঘটে ছিল। তাঁরা বাঙালীর যুক্তিশীল উদ্ভাবনী মননের উচ্চকোটিতে মানুষের চিন্তাভাবনার জগতে বহু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেই থেকে বাঙালী বৌদ্ধদের প্রসঙ্গে যাঁরা একসময় অগ্রণী ছিলেন তাঁদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও অনেকের কথা আজও অজানা।—

বাঙলায় বৌদ্ধেরা খৃষ্টীয় আটের শতকের পর থেকে অচিত্ত ধ্যান ও সমাধির সঙ্গে তাঁদের যুক্তিশীল ভাবনার এক রাখী বন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন। তা হোল, মন্ত্র প্রয়োগ ও যৌক্তিকতার সমন্বয়ী সহাবস্থান। গূঢ় ক্রিয়ালব্ধ বজ্রযানী বৌদ্ধচেতনার থেকে সরে গিয়ে বাঙলার মাটীতে সহজযানের উদ্ভাবন প্রায় পাঁচশো বছর ধরে বাঙালীকে এক বৌদ্ধিক উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছল। সেই পথের পরিচয় দিতে গিয়ে বাঙলার সিদ্ধাচার্যেরা 'জ্যান্তে হয়েছে মরা'। ইউরোপীয়েরা ঊনিশ শতকে যখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল তারা তখন ঐ

ব্যাপারটাকে বুদ্ধির অগম্য মিষ্টিক বা মিষ্টিশিসম বলে অনেকের কাছে ধোঁয়াটে করে ফেলেন। পরে তাঁরা কতকটা হদিশ পাবার পরও আজও 'সহজযান' অনেকের কাছে রূপকাত্মক অনির্দেশ্য। বস্তুত তা নয়, বাঙালী বৌদ্ধদের একদল ধ্যানসমাধির সঙ্গে যুক্তিশীলতার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে এক অভিনব ভাবনায় পৌঁছে যান। তাতে বৌদ্ধিকতার চেয়ে অন্তরের অনুভূতির প্রসঙ্গ অধিক হওয়ার ফলে অন্তরের নাড়ী বা সীমিত স্নায়ু-স্পন্দনের প্রকম্পের শাব্দিক অক্ষমতা প্রকাশ পায়। তাই অনেকটা যেন হেঁয়ালি ধরনের মনে হয়। আকাশকে পৃথিবী ছুঁতে চায়— কে ছুঁতে পারে? মানুষ। কেননা, মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আকাশের ও পৃথিবীর মাঝখানে। আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান সেই কথা হাতেকলমে করে দেখায়। তাই না!!

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ সঙ্ঘের সংগঠন

কালক্রমে বাংলা থেকে বৌদ্ধমতের ঐ মানুষেরা তাদের বস্তু অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগে। ঘটনাক্রমে আজ সেগুলির ভগ্নাবশেষ প্রত্নসম্পদ বাঙালীর বৌদ্ধচেতনার স্বাক্ষর হিসাবে আধুনিক বাঙালীর প্রাচীন গৌরব কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তিশীল মননের এক একটি অধ্যায়ে বাঙলায় কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধসংঘের সংগঠক হয়েছিলেন তার ধারাবাহিকতা আজও নিষ্পাদিত হয় নি। কারণ, অনেকেই এর ব্যাপকতায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন।

আগেই আলোচিত হয়েছে যে বাঙালীরা বৌদ্ধমতকে অন্যতম ধর্ম হিসাবে কিবাবে স্বীকার করেছিল তার সন তারিখ নিরূপণের প্রয়াস নিরর্থক। কেননা, চেতনার বিকাশ কোন দিন তারিখের সূচনার অপেক্ষা রাখে না। আরও ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের চেতনার বিকাশ নিয়ে প্রাচীন যুগের লোকসাহিত্য ও ইতিহাস পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। মগধ ও বৈশালীর বৌদ্ধধারার ধারক ও বাহকেরা শুঙ্গ যুগ থেকেই বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মৌর্য যুগে পশ্চিমোত্তর ভারতবর্ষের বৌদ্ধেরা তখনকার ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যেতে ব্যস্ত। একদল বৌদ্ধ সেই দুরন্ত অভিযানে অংশ নেন নি। তাঁরা অনেকেই বুদ্ধবচনের গম্ভীরতা নিজেদের বুদ্ধিবিচার ও বিদর্শনভাবনার ভিতর দিয়ে অনুভবের অভিজ্ঞতায় বিভোর ছিলেন। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধী শ্রমণ পরম্পরা, যতিপরম্পরা ও ব্রাহ্মণ্য পরম্পরার সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। সেকথা লামা তারনাথের 'বৌদ্ধচেতনার পুনর্জাগরণের' পরিচয়ে বলা আছে। তারনাথ এই ধরনের বৌদ্ধদের সঙ্গে বিরোধ, অবক্ষয় ও তার পুনর্জাগরণের বিবরণ বারংবার দিয়েছেন।[১৩]

তারনাথের ইতিকথার পিছনে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্বের মূল প্রবাহ লুকিয়ে রয়েছে। বারংবার বৌদ্ধনিগ্রহের পিছনে সাধারণ মানুষের সমাজ ও রাজন্যশক্তির প্রভাব ছিল। সেই বিশেষ দিকগুলি এরূপ[১৪]—

১। বৈদিক সমাজে মানুষের শরীরের বর্ণ দিয়ে আভিজাত্য নিরূপণ করে শ্বেতবর্ণ ও গৌরবর্ণের লোকেরা নিজেদের 'আর্য' বা উন্নততর মানববর্গের বলে দাবী রাখত। তারা

অন্য জনগোষ্ঠীকে অশ্বেত, অগৌর, বর্ণের বলে নিজেদের ভিন্ন করে বর্ণের আভিজাত্যের বিকাশ ঘটায়। যারা তাদের বাইরে তারা অনার্য বা আর্যেতর। সেই ভেদনীতি আজ অবধি অস্পৃশ্যতা, অছ্যুৎ বাচবিচারে ব্রাত্য বা ত্যাজ্য নীতিতে ভারতবর্ষের সমাজে বিদ্যমান।

২। অপরদিকে শ্রমণ সংস্কৃতিতে বৌদ্ধেরা জৈন, আজীবক ছাড়াও যতিসন্ন্যাসী বেদবাহ্য বৌদ্ধিক চিন্তাশীলেরা তাদের বিপরীত চিন্তায় ধারক ও বাহক ছিল। তাদের কাছে শরীরের বর্ণের 'কালো ধলো' বিচার গৌণ ছিল। মর্যাদা ছিল মানুষমাত্রের স্বভাবজাত গুণ ও সামাজিক শীলাচার। পরবর্তীকালে বৈদিক স্মার্ত চিন্তাশীল বৌদ্ধিক অনেকে সদাচারকে মর্যাদা দিলেও বর্ণের বৈষম্য বিচার থেকে আভিজাত্যের গৌরব অস্বীকার করতে পারে নি। শ্রমণেরা গুণগ্রাহ্য নীতির উপর নির্ভর করে। তারা বর্ণবৈষম্য, জন্মের ও কুলের আভিজাত্যের নিন্দক। ভারতবর্ষের সমাজের স্তরে স্তরে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের অহিনকুল সম্বন্ধ আজও দূরীভূত হয়নি।

৩। অথচ ভারতবর্ষ বিশাল ছিল। নানা বর্ণের, নানা ভাষাভাষী ও নানা প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বয়ংনির্ভর মানবগোষ্ঠী এই ধরনের বাচবিচারের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বাস করে আসছে। তারনাথ তাদের অনেকের কথা বলতে দ্বিধা করেন নি, কেননা তারা কেউ কেউ বৌদ্ধমত গ্রহণ করেছিল। তবে এই জনসমাজ নিজেদের ভিতরে স্বতন্ত্র থাকার ফলে অনেক জায়গায় অজ্ঞাত, অপরিচিত। তাদের গাত্রবর্ণ এক ধরনের ছিল না। বৈদিক আর্যেরা তাদের কিন্নর (কুৎসিত নর), গন্ধর্ব, যক্ষ, বেতাল, নাগ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, ভূত ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের সমাজগঠনে বৌদ্ধিকতার প্রাধান্য থাকার ফলে বৈদিক জন্মগত জাতিভেদ নিরর্থক ছিল। বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে ধম্মপদের ব্রাহ্মণ-বগ্গের পাশাপাশি ভিক্খুবগ্গ সংযোজিত হয়েছে। সবার সামনে পূজনীয় হিসাবে অর্হৎবগ্গ সন্নিবেশিত। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখনীয় যে, তখনকার সমাজে অপরিচিত স্বয়ংভর গোষ্ঠীর যারা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে, বনে জঙ্গলে, কান্তারে, সমুদ্রের উপকূলে, পাহাড়ের সানুদেশে বাস করত তাদের সঙ্গেও বৌদ্ধদের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে যে বৌদ্ধিক যুক্তিশীল মনের মানুষের কাছে যা কিছু 'অদ্ভুত' 'আশ্চর্য' ও যুক্তিগ্রাহ্য নয় তা অবিশ্বাসের। রহস্যঘন, মিষ্টিক। বৌদ্ধ পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালে ঐ ধরনের মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যুক্তিনিষ্ঠ বৌদ্ধেরাও পরিত্তামন্তে, ধারণীমন্ত্রে, সর্পদংশন মন্ত্রের আস্থাশীল ছিল। গন্ধর্ব, যক্ষ কিন্নরদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তিব্বতী স্রোতে দ্রমিল (দ্রাবিড়)জনের থেকে নাগমন্ত্রও বৌদ্ধেরা উত্তরকালে গ্রহণ করেছিল।

বিদগ্ধজনেরা এই ধরনের অবিশ্বাস্য 'অদ্ভুত'[১৫] 'আশ্চর্য'[১৬] যুক্তিবিবর্জিত বিষয়গুলি বৌদ্ধচেতনার উত্তরকালে অবক্ষয়িতরূপ তথা 'তন্ত্র' বলে উপেক্ষা করে থাকেন। যখন বুদ্ধের যুক্তিনিষ্ঠ চেতনা বহুজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে উদ্যোগী হয়েছিল, তখন

সাংস্কৃতিক লেনদেন ঘটে। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর 'অদ্ভুত' ও 'আশ্চর্য' বিষয়গুলিও বৌদ্ধদের কাছে প্রায়োগিক কারণেই বস্তুত গ্রাহ্য হয়েছিল। মহাযানের উদার প্রসারের ফলে পারমিতা চর্যা সর্বত্র কালোপযোগী হয়ে ওঠেনি। তখন বৌদ্ধেরা তন্ত্র তথা মন্ত্র নয়কে নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিল। বাঙালী তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা সেখানে অরূপের ধ্যানের ভিতর দিয়ে মন্ত্রতন্ত্রে যুক্তিনিষ্ঠ যোগের সন্ধান করেন। মূর্তিকলায় তা বিকাশ লাভ করে।

বাংলায় বৌদ্ধেরা গুপ্তযুগের আগেই ছোট বড় সঙ্ঘ-সংগঠনে বিভক্ত ছিল। তার আগে বৈশালী সংগীতির সময় বৌদ্ধদের 'সংকায়' ভেদ ঘটে। পরে নিকায়-ভেদ হওয়ার ফলে স্থবিরবাদ নিকায়ের দুটি বড় বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। তা হোল মগধের স্থবিরবাদ বা থেরবাদ নিকায়, আর গান্ধার কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদী স্থবির নিকায়। সর্বাস্তিবাদীরা আবার মথুরার মূল সর্বাস্তিবাদ নিকায়ে বিভক্ত হয়। সর্বাস্তিবাদীরা নিজেরা সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সংকায়ে এক ভিন্ন স্থিতিতে উপনীত হওয়ার ফলে বাঙালী বৌদ্ধেরাও সেই অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি অনুসরণ করে। সেদিক থেকে নালন্দা, মহাবোধি, বিক্রমশিলা ওদন্তপুরী মগধে বাঙালী বৌদ্ধদের নিয়ামক ও বিধায়ক হয়ে উঠেছিল। পরে যখন রাজন্যশক্তি বাঙালীকে মাগধরাজ শক্তির আনুগত্য থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছিল তখন বাঙালীর বৌদ্ধচেতনা এক অভিনব মানের সন্ধান পেয়েছিল। তখন ঐ চেতনা নালন্দা মহাবোধি, বিক্রমশিলা ওদন্তপুরীর ভদন্তদের কাছেও সমীচীন হয়ে উঠেছিল। তা হোল''সহজযান'' ও ''কালচক্রযান'' এর উদ্ভাবন। ফলে বৌদ্ধ চেতনায় নবীন যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল খৃষ্টীয় ৯ম-১১শ শতকে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসারে মধ্যম-পন্থার মানুষের জীবনযাত্রার গতি গৃহী উপাসক উপাসিকার কাছে যেভাবে গ্রহণীয়, সংসারত্যাগী ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পক্ষে তা এক ধরনের নয়। সম্যক অজীব বা জীবনধারণ প্রণালীর কেন্দ্রবিন্দু উপাসক উপাসিকার কাছে স্পষ্ট কারণেই ভিন্ন।[১৬] তাদের কাছে সম্যক বাক্যকে কেন্দ্র করেই অষ্টাঙ্গ মার্গের মূল্যমান স্থির করা হয়। অপরদিকে বনবাসী ভিক্ষু হোন, বা বিহারবাসী শ্রমণ শ্রামণীরা সম্যক দৃষ্টিকে তাঁদের জীবনের কেন্দ্র করেন, চিত্তের আবরণগুলির অপনয় সন্ধান করেন। বাঙালী বৌদ্ধেরা সেখানে এক সেতুবন্ধনের প্রয়াস করেছিলেন। তাঁদের চিত্তের আবরণগুলি উন্মোচনের জন্য সংসার ত্যাগ সর্বত্র মুখ্য হয়ে ওঠে নি। রাগ, দ্বেষ ও মোহ মারের এই তিন রতি ততক্ষণ মানুষমাত্রকে আবিষ্ট করতে পারে, যতক্ষণ মানুষের মন তথা চিত্তের আবরণে ক্লেশযুক্ত হয়ে থাকে। সেখানে ঘর ছাড়া বা ঘরে বাস করা অনেকটা গৌণ। বরং ব্যক্তিগত প্রাচীন বাঙালীর বৌদ্ধচেতনায় সহজযান ও কালচক্রযানে মানুষের সহজাত চেতনার নবীন আলোড়ন ঘটে ছিল এক অভিনব উপায়ে। এখানে 'উপায়' শব্দটির তাৎপর্য ভৌতিক ও তার ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞা-লোকে। শীল ও সমাধি প্রজ্ঞার উদ্বোধক। সেখানে প্রতিক্ষণের সচেতনতা উজাগরতা চিত্তকে কুশলধর্মের সঞ্চয় থেকে রাগ, দ্বেষ ও মোহ রতির মায়াজালে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেয় না। কমলশীল তাঁর 'ভাবনাক্রমে' সেই চেতনার বৈজ্ঞানিক ক্রম নির্ধারণ করেছিলেন তত্ত্বগতভাবে। অপরদিকে, ইন্দ্রভূতি সময়বজ্র তথা ডোম্বীহেরুক, সহজসিদ্ধি নূতন নূতন

করে বাঙালীর 'অচিন্ত্য অদ্বয়' চেতনার উদ্বোধন করেছিলেন।[১৫] যোগিনী লক্ষ্মীংকরা ইন্দ্রভূতির ভগিনী 'অদ্বয় সিদ্ধি'তে স্পষ্টভাষায় বলেন— কোন তিথির হিসাব নাই। কোনো লক্ষণের গতিপথের বিচার নাই, কোনো ব্রত উপবাসের প্রয়োজন নাই সৌগতী সিদ্ধি কুশলময়ী কল্যাণী সিদ্ধি। তা শুধু অদ্বয়জ্ঞানে নিরন্তর যুক্ত হয়।

ন তিথিনং ন নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
—অদ্বয়জ্ঞানযুক্তস্য সিদ্ধির্ভবতী সৌগতী।। (অদ্বয়সিদ্ধি, শ্লোক ২৪)

বলা বাহুল্য, হিউ এন সঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে, তিনি পুন্ড্রবর্ধনে কুড়িটি, সমতটে ত্রিরিশ, তাম্রলিপ্তিতে দশ ও কর্ণসুবর্ণে দশটি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। সকল বৌদ্ধ বিহার একই চেতনায় উদ্বোধিত ছিল এমন নয়। বিহারবাসি-শ্রমণেরা সমাজের আর্থ রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে অনেক সময় চলতেন। গ্রামীণ মানুষেরা তখনকার নাগর সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক তথা রাজনৈতিক অবস্থার থেকে নিজেদের অনেকটা দূরে রাখতে পারতো। তাদের কাছে দারিদ্র্যের কৃষ্টি 'কালচার অফ পভার্টি' সতত বিরাজ করত। ফলে তাদের চিন্তায় 'আগন্তুক মল' প্রবেশের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকতো না। সিদ্ধাচার্যেরা তাই তখনকার সমাজের সাধারণ ঘরের মানুষ। দৈনন্দিন জীবিকা সন্ধানে চলতে গিয়ে দারিদ্র্যকে কর্ষণ করে এক অভিনব ব্যক্তিগত অদ্বয়তার সন্ধান পেতেন। উপরে বিদুষী লক্ষ্মীংকরার কণ্ঠে সেই কথা ধ্বনিত হয়েছে। তাই না!!

বাংলার সাধারণ মানুষের বৌদ্ধচেতনা

প্রয়াতা অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা সিদ্ধাচার্যদের জীবনগাথা লিখতে গিয়ে স্পষ্ট প্রাচীন বাঙালীর দারিদ্র্যের কৃষ্টির মহিমা প্রকট করতে প্রয়াস করেছেন। অনেকে মনে করেন, জীবনে অবসর না থাকলে স্বকীয় চিন্তার বিকাশ হয় না। বৈদিক অম্ভৃণ-ঋষি কন্যা বাক্-এর জীবনকথা জানি না, কিন্তু সেই অভিজ্ঞাসিদ্ধ মহিলা মানুষকে শুনিয়েছেন—'আমি রুদ্রদের সঙ্গে, আমি বসুদের সঙ্গে, আমি পবমান বায়ুসমূহের সঙ্গে, আমি চন্দ্র সূর্য সবার সঙ্গে বিরাজ করি।'[১৭] বিশ্বশক্তির বহুতার সঙ্গে একক মানুষের সমীকরণের উদারচেতনা সেই ঋষিকন্যার অভিজ্ঞাপ্রসূত। তেমনি লক্ষ্মীংকরা রাজকন্যার সৌভাগ্য ত্যাগ করে পথে মাঠ ঘাটে যোগিনী হয়ে যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার উদার চেতনা 'অদ্বয়জ্ঞান যোগের' কথা ফুটে উঠেছে।

আজ বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান প্রাচীন বৌদ্ধসমাজের গৌরবগাথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিব্বতী ভাষায় লেখা ইতিহাস, চীন পরিব্রাজকদের বিবরণ প্রাচীন বাঙালীর বৌদ্ধচেতনার দিগন্তের পরিচয় দেয়। তা নিয়ে কৌতূহলের সীমা নাই। প্রায় দুশো বছর আগে বাঙালীরা নূতন করে অবক্ষয়িত বৌদ্ধমতের নানান দিক তুলে ধরেছেন। সেখানে এক মহীয়সী নারী রানী কালিন্দীর (১৮৩২-৭৩) উদার প্রশস্য দৃষ্টির স্বাক্ষর অধুনা বৌদ্ধবাঙালীর যুক্তিশীল চেতনার স্বাক্ষর।[১৮] তন্ত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞানযোগ থেকে

সরে গিয়ে একদল বাঙালী যখন তান্ত্রিক আচারবিচার ও পূজোপার্বণের সঙ্গে তিথি নক্ষত্রের গণিত নিয়ে নিজেদের ক্লিষ্টচিত্তের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে উঠেছিল সেই সময় রানী কালিন্দীর ভিতর এক কুশল-ভাবনার উন্মেষ ঘটে। সেই চেতনায় উদ্বোধিত বাঙালী বৌদ্ধসমাজ চট্টগ্রাম কুমিল্লা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ইংরাজ আমলের কলিকাতায় এক অভ্যুদয়ের চেতনার সূত্রপাত করেন। আজকালকার বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও চাকমা অঞ্চলের থেকে বৃটিশ আমলে আর্থসামাজিক ও রাজকীয় প্রশাসনিক কাঠামো ভিন্ন ছিল। কক্সবাজারের ইংরাজ সাহেবদের কুঠি আজ নাই। তবু বাঙালীর বৌদ্ধচেতনার অগ্রগতির যে ধারা চলেছে তা সেই বৃটিশ শাসনে ভারতীয়দের উদার ধর্ম আচরণের সুযোগ।

প্রমোদরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয় নালন্দা পত্রিকায় এক মনোজ্ঞ আলেখ্য তুলে ধরেছেন তাঁর 'পাহাড়পুর বুদ্ধমন্দিরে গ্রাম বাংলার জীবন চিত্র'। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৌদ্ধেরা সাধারণ স্তরের সকল মানুষকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেনি। তা গৌতম বুদ্ধের জীবিতকালেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তাদের সবার কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ মিলে। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে তা যত্রতত্র মিলে। পালি অটঠকথায় অনেকের কথা আছে। যেমন থেরীগাথা, থের গাথা ও জাতক অট্ঠকথায় মিলে। তেমনি মহাবস্তু অবদান, দিব্যাবদান ও পরবর্তী অবদানশতক ও বোধিসত্ত্ব-অবদান-কল্পলতায় আছে। গণ্ডব্যূহ, কারণ্ডব্যূহ ছাড়া মঞ্জুশ্রী-মূলকল্প, পরিপৃচ্ছা বৌদ্ধ গ্রন্থেও দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, উনিশ শতকে বৌদ্ধমতের পুনর্জাগৃতির পর থেকে বৌদ্ধসমাজ ঐ উদারনীতি অনুসরণ করে চলেছে। সেদিক থেকে ভারতের বৌদ্ধ সমাজ কয়েকটি পর্বে বিভাজন করা যেতে পারে।

(ক) তারনাথের বিবৃতি অনুসারে প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ তিনবার সামাজিক অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন। সে সময় ভারতবর্ষের প্রত্যন্তদেশে বৌদ্ধজনেরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

(খ) অপরদিকে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত অবধি বিভিন্ন বৌদ্ধজন গোষ্ঠী নির্বাধভাবে তাদের বুদ্ধচেতনা আজও পোষণ করে চলেছে। তারা ভৌট্ট তিব্বতী, আরাকানী।

(গ) উনিশ শতকের ইংরাজ শাসনের আমলে ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধমতের পুনর্জাগরণের ফলে সাধারণভাবে বাঙালীদের ভিতর বুদ্ধচেতনার যুক্তিপ্রবণ চেতনার যুগোপযোগী অভ্যুদয়।

(ঘ) ঐ ধারা অনুসরণ করে ভারতের স্বাধীনতার পর মহারাষ্ট্রে বাবাসাহেব বি. আম্বেদকরের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক দলিত মানুষ বুদ্ধমতে আশ্রিত হয়েছে। তারা তাদের মানবের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে যারা সামাজিক ন্যায়বোধের চেতনায় পীড়িত ছিল।

অভ্যুদয়ের পথে বাঙালীর বৌদ্ধচেতনা ভারতবর্ষ বিভাগের পর বাংলাদেশ ও ভারতে এক নিজস্ব ঐক্যের আস্বাদ উপলব্ধি করেছে। ডাঃ পুলক মুৎসুদ্দি তাঁর একটি নিবন্ধে তা প্রকাশ করেছেন। গত ষাট বছরে বাংলাদেশে ও ভারতে বাঙালী বৌদ্ধদের আর্থসামাজিক উন্নতির পাশাপাশি জীবন জিজ্ঞাসা ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার পরিচয় বাঙালী বৌদ্ধ পত্রিকার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

চট্টলের চাটিগাঁও এর পিণ্ডক্যে বিহার

তারনাথ তাঁর বিবরণে বিগমলবিহার ও পিণ্ডক্যে বিহারের কথা বলেছেন। বিগমল বিহার পট্টিকেরকদের তাম্রশাসনে উল্লিখিত (১২২০ খৃঃ) বেজখণ্ড বিহার কিনা নিরূপণ করা কঠিন। তবে পিণ্ডক্যে বিহার পরবর্তীকালের পণ্ডিত বিহার ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। ঐ বিহার তিব্বতী শব্দের রূপান্তরে চ-টি-ঘ-বো নগরীতে ছিল। পণ্ডিতেরা অধুনা ঐ তিব্বতী নামের প্রতিবর্ণীকরণ থেকে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা করেন। তবে তারনাথ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে কে-কি দেশের বৌদ্ধদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাঁর "অপরান্তক" শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোলে ব্যবহার করা হয়েছে। তান্ত্রিক সাহিত্যে যেমন ক্রান্তি-বিভাজন আছে তেমনি 'অন্তক' বিভাজন পুরাণ সাহিত্যে মিলে। যেমন অশ্মান্তক অর্থাৎ পশ্চিমোত্তর ভারতের হিমালয়ের হিমবান পর্বত সংলগ্ন পাথুরের অসমতল ভূপৃষ্ঠের অঞ্চল। তেমনি পূর্বে 'অপরান্তক' বললে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ওড়িবিশ (ওড্রিদেশ/উড়িষ্যা) সহ বঙ্গাল কুমারু, ত্রিপুরা, হংসবতী, হসম প্রভৃতি সমতল ও অসমতল ভূপৃষ্ঠের অঞ্চলকে বোঝাতো। তারনাথ ঐ প্রসঙ্গে কম-বো-জ, চক ম, কো কি, মু-ঞ্চৎ্ মার-কো প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি আরাকানের থেকে পূর্বদিকের ভূখণ্ড।

তিব্বতী চ-টি-ঘ-বো শব্দটি অলকা চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'চটিগাঁও' এর সমতুল। তবে এ বিষয়ে স্নেড হাচিনসন[১৯] থেকে শুরু অনেকে কু-কি জনের বিস্তৃত বাসভূমি অনুমান করেছেন। কেননা, চট্টগ্রাম অতি প্রাচীন বাণিজ্যপোত। তা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার আরাকানীরা শুধু নয় পরবর্তীকালে আরবী, পর্তুগীজ, পারসিক ও মুঘল বণিকেরাও ঐ বন্দরে নৌবাণিজ্য করেছে। 'চক-মা' বা 'কো কি' গোষ্ঠীর মানুষেরা অতি প্রাচীনকাল থেকে বুদ্ধের শীলধর্মে আস্থাশীল ছিল, তারনাথ তা উল্লেখ করেছেন। আরাকানেও খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। আরাকানী ভাষায় 'চিট টও গোয়াও' শব্দের ধ্বনি বিকারে তিব্বতী তারনাথের 'চটিগাবো' হয়েছে কিনা বলা কঠিন। যাই হোক, চট্টগ্রাম বাণিজ্যপোত হওয়ার ফলে আরাকানী থেকে শুরু করে কো কি বা কু কী, চকমা বৌদ্ধ সবাই সমবেত হয়েছিল, সে বিষয়ে তারনাথের উল্লেখ আছে। তা অশোকের সময় থেকে কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে ধর্মপালের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে বৌদ্ধমতের প্রসার ঘটে ছিল। পিণ্ডক্যে বিহার তারই স্বাক্ষর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়।

এই প্রসঙ্গে অপরান্তকের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের সার্থবাহ বণিকেরা চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবেশ করত তার প্রমাণ মিলে। ঐ বাণিজ্য পথের নাম ছিল গিরিবর্ত্ম (বিকৃত উচ্চারণে গিরিবট্ট)। কামরূপ (বর্তমান আসাম) ধরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে ধারে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর গিরিপথটি উত্তরে চিন ও দক্ষিণদিকে প্রসারিত ছিল। তা পু কন (পুগন/পাগান সুবর্ণভূমি) চম্পা (ভিয়েতনাম) কমবোজ (কেম্বাডিয়া) যেতে হলে দক্ষিণের পথ ছিল।

অনেকে মনে করেন মণিপুরের মইরঙ শব্দটি সম্ভবত মৌর্য, মৌরিয় বা মৌরির বিকারে গড়ে উঠেছে। মৌর্য যুগের মগধের বণিকেরা হরিকেল (বর্তমানের চট্টগ্রাম) হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে চিনে প্রবেশ করত। লাট বা রাঢ় (দক্ষিণ-পশ্চিম অনুর্বর উত্তত) ভূমির দক্ষিণে তাম্রলিপ্তের মত কাঞ্চীপুরী (বর্তমানের চট্টগ্রাম) প্রাচীন নৌবাণিজ্যের পোতকেন্দ্র ছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধমত ধীরে ধীরে বঙ্গালে ও ওডিবিশে তান্ত্রিক মন্ত্র-নয়ে প্রসারিত হওয়ার ফলে পিণ্ডক্যে পণ্ডিত বিহারে চৈত্য পূজার পাশাপাশি অগর-তারার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিপূজার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অগর তারার শাব্দিক অর্থ ও তার ব্যবহার গত প্রয়োগ নিয়ে মতভেদ থাকলেও অগরশাস্ত্রের পুঁথিগুলি তালপত্রে লেখা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্ত্রতন্ত্রের পুঁথি।

পিণ্ডক্যে বিহার তথা পণ্ডিত বিহার নিয়ে যে সকল তথ্য আজ অবধি অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) পণ্ডিত বিহারের নামকরণ পিণ্ড বিহার, পিণ্ডক বিহার বা পণ্ডিত বিহার কোনটি। শেষোক্ত নাম নিয়ে তারনাথের কাহিনী হয়তো কিছুটা উত্তর নিয়ে আসে। কাহিনীটি এরূপ খৃষ্টীয় নবম শতক নাগাদ বৌদ্ধেরা অবৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের কাছে বারবার পরাজিত হয়ে অবৌদ্ধ বা তীর্থিক মত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিল। ঐ সময় কিছু তীর্থিক অবৌদ্ধ পক্ষ ঐ বিহারের প্রবীন বিদ্বানদের কাছে শাস্ত্রার্থ বা ন্যায়সম্মত যুক্তি দিয়ে বিচারসভা আহ্বান করে। সম্ভবত তা আরাকান রাজা থুলা চেইঙ্ সেন্দার (৯৫১-৫৭ খৃঃ) আগেকার কথা। ঐ বিচারসভার আমন্ত্রণ পেয়ে বিহারের অভ্যন্তর কক্ষে বৌদ্ধ মঠের প্রবীন বিদ্বানেরা নিজেদের ইতিকর্তব্য নিয়ে চিন্তাভাবনায় বসেন। ঐ সময় কোথা থেকে এক প্রবীনা যোগিনীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সেখানে উদয় হয়ে মঠাধ্যক্ষের হাতে একটি 'উ-শ্ব' দেন। তিব্বতীতে টুপী। বৌদ্ধভিক্ষুদের বরিষ্ঠেরা যা ব্যবহার করেন তাকে উ-শ্ব বলা হয়। কিংবদন্তী আছে যে, বিহারের মূর্ধণ্য প্রবক্তা ঐ টুপী পরে যখন শাস্ত্রার্থ করেন তখন বিরোধী তীর্থিক অবৌদ্ধেরা পরাজয় স্বীকার করে ও বৌদ্ধমত গ্রহণ করে। সম্ভবত তারপর থেকে ঐ বিহারের নামকরণ 'পণ্ডিত' বিহার হয়।

(খ) দ্বিতীয় সমস্যা হোল, পণ্ডিত বিহারের অবস্থান সঠিক কোথায়। শরৎচন্দ্র দাস তা দেবপাহাড়ের সন্নিকটে বলেছেন। তা নিয়ে মতভেদ আছে। অন্দর কিল্লাহ মসজিদের পাহাড়ের মাথায় তার অবস্থিতি কি না তা অনুমানের বিষয়। নলিনীকান্ত দাসগুপ্তের (দৈনিক পাঞ্চজন্যে প্রকাশিত শারদীয়া সংখ্যায়) পণ্ডিতবিহারের তিলোপা প্রসঙ্গে আলোচনায় পণ্ডিতবিহার দেয়াঙ্ পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল বলে অনুমান। এই যুক্তির পক্ষে চট্টগ্রামের জিওরি থেকে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তিগুলির কথা আসে। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত অশোক ভট্টাচার্যের মতে ঐগুলির ভিতর নিম্নলিখিত মূর্তি আছে।

(১) ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন প্রতিমা সহ বসুন্ধরা (বসুধারা)
(২) লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব
(৩) পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব
(৪) মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব
(৫) চুন্দা

তা ছাড়া মহাবোধি মন্দির ও সছত্র স্তূপ মিলে। ঐ মূর্তিগুলি সংগ্রহের বিষয়ে ব্রিটিশ আমলে কিভাবে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দখলে এসেছিল তার বিবরণ জামালউদ্দিন সাহেবের দেয়াঙ্ পরগণার ইতিহাস (আদিকাল) গ্রন্থে মিলে।

(গ) পণ্ডিত বিহারের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়ে তিব্বতী স্রোত থেকে যতদূর জানা যায় তা হোল যে সেখানে আচার্য প্রজ্ঞাভদ্র সেখানে সম্ভবত অষ্টম শতকে বিরাজমান ছিলেন। প্রজ্ঞাভদ্র সিদ্ধাচার্য তিলোপাদ বা তিল্লীপা ছিলেন কি না তা বিচার সাপেক্ষ। তিলোপা ও প্রজ্ঞাভদ্র দুই ব্যক্তি হলে, নাড়াপাদ বা নারোপা ছিলেন তিলোপার শিষ্য। নারোপার শিষ্য ছিলেন তিব্বতের মিলারেপার গুরু মার পা। অতএব পণ্ডিতবিহার একদিন সহজযানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শন ও বজ্রযানতন্ত্রের অধ্যায়ন কেন্দ্র ছিল। তার কারণ কামরূপ পীঠ থেকে পণ্ডিতবিহারের দূরত্ব বেশি ছিল না। অন্যদিকে পার্বত্য ত্রিপুরার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকায়ত কো-কি জনগোষ্ঠীর নিসর্গচারিতায় ঐ অঞ্চলের পরিবেশ রহস্যাবৃত 'অদ্ভুত' ও 'আশ্চর্যের' ছিল।

শরৎচন্দ্র দাসের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত বিবরণে ঐ বিহারের সঙ্গে শবরীপা, অবধূতিপা, অনঙ্গবজ্র, অমোঘবজ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বানদের নাম জড়িত। তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার যথেষ্ট উপাদান নাই। তবে বনরত্ন বা বলিরত্নের বিবরণ তিব্বতী স্রোতে বারংবার মিলে। আচার্য বনরত্ন ভারতবর্ষের শেষ বৌদ্ধ পণ্ডিত পেন-ডিত-যা-ন) আনু. ১৪২৬ খৃঃ তিব্বতে পদার্পণ করেন। তিনি পণ্ডিত বিহারের পালি থেরবাদ নিকায়, অভিধর্ম সবাপ্তিবাদ নিকায় ও যোগতন্ত্রের পরম্পরায় নিস্নাত ছিলেন। তিনি সিংহলে গিয়ে থেরবাদ নিকায় ঐ সময়ের বৌদ্ধ বিদ্বান বুদ্ধঘোস ও সুজাতরত্নের কাছে অধ্যয়ন করেন। অপর দিকে কলিঙ্গের নরাদিত্যের কাছে অবৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করার পর মগধে বৌদ্ধ সংস্কৃতে পারংগম হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে গোয় লো চা রা (খৃঃ ১৪শ শতক) নীল পুরাণ (দেব থের সোন পো) গ্রন্থ ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি অভয়াকর গুপ্ত—নায়ক পাদ (?)—দশবলশ্রী—শ্রীভদ্র—ললিতবজ্র—ধর্মগুপ্ত—রত্নাকরশান্তি (শান্তি-পা) ও পদ্মবজ্রের পরম্পরার অনুগামী। তিনি আমাদের (তিব্বতীদের) সবচেয়ে উচ্চকোটির বরেণ্য ও শরণ্য পণ্ডিত ছিলেন (পৃঃ ৩৮০, ব্লু-অ্যানালস্, এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৫২ সংস্করণ)।

প্রাচীন বাঙালীর বৌদ্ধচেতনার শেষ অভিব্যক্তির প্রমাণপুরুষ পণ্ডিতবিহারের আচার্য বনরত্ন আজও প্রণম্য।

টিপ্পনী ও স্রোত পরিচয়

১। সুনীতিকুমার পাঠক, বৌদ্ধসংঘের সংগঠন, সংগঠন (পত্রিকা), কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; বৌদ্ধ সংঘ ও সংগঠন, *মাসিক বসুমতী* ১৩৫৭।

২। পি. ডি. কানে, *হিস্টরী অফ ধর্মশাস্ত্র*, পুনে ২য় খণ্ড, ১৯৫৭।

৩। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, *প্রি-বুড্ডিষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিলসোফী*।

৪। লামা ছিম-পা ও অলকা চট্টোপাধ্যায়, *তারানাথস হিষ্টরী অফ বুদ্ধিসম ইন ইণ্ডিয়া*, দিল্লী, ১৯৯৭ সংস্করণ। ঐ হিন্দী অনুবাদ এলাহাবাদ প্রকাশন।

৫। বি ভ্যালেসর, লাইফ অফ নাগার্জুন ফ্রম চাইনিস মেটিরিয়লস্, তুঙ্ পাও, ১৯১২।

৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রদ্বীপ, *ভারতকোষ* ৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কলিকাতা।

৭। সুনীতিকুমার পাঠক, আচার্য চন্দ্রগোমী (পগ্ সম জোদ্ সঙ্ তিব্বতী ইতিহাস সূত্রে), *জগজ্জ্যোতি*, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৮। অদ্বয়বজ্র—তত্ত্বরত্নাবলী, *অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ*, সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বরোদা ১৯২৬।

৯। কে টি এস সরাও, *অরিজিন অ্যান্ড নেচার অফ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিসম্*, তাইপেই তাইওয়ান, ২০০৬।

১০। গোকুল চন্দ্র দে, *ডেমোক্রেসি ইন অর্লি বুদ্ধিসম্*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮।

১১। ধম্মপদ ১৪/৫-৭, অটঠকথা অনুসারে ভদন্ত আনন্দের পরিপৃচ্ছার ব্যাকরণে গৌতম বুদ্ধের বচন বলে ধরা হয়।

১২। মজ্ঝিম নিকায়ে সতিপটঠান সুত্তে কায়, বেদনা, চিত্তও ধম্মের স্মৃতিমান অনুপশ্যনা ছাড়াও ত্রিকায় ভাবনায় অধিগম হলে ত্রিকায়, বলবশিতা, অভিজ্ঞা, বৈশাবদ্য প্রভৃতি অনুত্তর উপায়কৌশল্যে অধিষ্ঠানের কথা তেবিজু বচ্ছগোওসুত্তে, মহাসীহনাদ সুত্তে ও বক্কলিসুত্তে মিলে। 'যো ধম্ম পস্সতি সো মং পস্সতি, যো মং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি' ইত্যাদি বচনের দ্বারা অদ্বয়ভাবনার দ্যোতনা পালি সুত্তপিটকে প্রতীয়মান হয়।

১৩। প্রাগুক্ত টিপ্পনী ৪, পৃঃ ১২০-২২, ১৩৭-১৩৯, ১৪৫-১৪৬ দ্রষ্টব্য।

১৪। সুনীতিকুমার পাঠক, দূরদর্শী রাজা অশোক, *নালন্দা* অশোক স্মারক সংখ্যা।

১৫। সিদ্ধাচার্যদের সাধনার 'অদ্ভুত' 'আশ্চর্য' শব্দগুলি নিয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেকের কাছে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, হেয়াঁলির অর্থসংগতি হাতড়ে বেড়াতে হয়। কেউ কেউ বা মিষ্টিক সিম্বলিক, হারমিউনিটিক বলে মনে করেন। বস্তুত তাই কি? অন্তর্মুখীনতায় চিত্ত তার চঞ্চল স্পন্দনশীলতা একাগ্রীভূত হয় তখন যে অনুভূতি জাগে তা অদ্ভুত। অর্থাৎ, ভব বা হওয়ার জগতের সীমা অতিক্রম করে। অদ্ভুত শব্দের গঠন অতি-ভুবো-ডুতচ্, এখানে অতিক্রান্ত। যা জাগতিক ক্ষয়শীলতাকে অতিক্রম করে। আশ্চর্য (আঃ চর্য) চর্যায় বা আচরণে যা বিস্ময়কর ভাবে ব্যাপ্ত, সেটিতে যোগীর চিত্তে একটা বিস্ময়কর প্রশান্তি ভাবের উদয় ঘটে, তাই 'আ' এর ব্যাপ্তি বিসর্গে নিঃসীম হয়ে যায়।

১৬। গৌতম বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রশংসা ধম্মপদে বারবার বলা হয়েছে। ধম্মপদ গৃহী উপাসক উপাসিকা ও গৃহত্যাগী শ্রমণ বা বনবাসী ও বিহারবাসী সবার উপযোগী। সম্যক আজীব সকলের জন্য। তার প্রয়োগ ভেদ আছে। লেখকের ইংরাজী নিবন্ধ এথিক্যাল ভ্যালু প্রাকটিস অ্যাণ্ড ইণ্ডিকটিবেটান রিসোর্স নিবন্ধ থাইল্যাণ্ডের ইন্টারন্যাশন্যাল বুদ্ধিষ্ট ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েশনের প্রকাশিত বুদ্ধিসম্ অ্যাণ্ড এথিকস্ দ্রষ্টব্য।

১৭। ঋকবেদ ১০ মণ্ডল ১২৫ সূক্ত।

১৮। নন্দলাল শর্মা, বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে রানী কালিন্দীর অবদান, নালন্দা, ১৭ বর্ষ, ২৫২৬ বুদ্ধাব্দ।

১৯। 'অন্তক' 'ক্রান্তি' 'বর্ষ' 'দ্বীপ' প্রভৃতি প্রাচীন ভারতবর্ষের দেশিক পরিমাপক বিস্তারের সূচক শব্দ।

২০। প্রাগুক্ত ৪৯, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

স্রোতপঞ্জী

বাঙলা (গ্রন্থ)

অতীন মজুমদার, চর্যাপদ, নয়াপ্রকাশ ১৪০০ সংস্করণ

ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, শান্তিনিকেতন ১৯৯৭

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, চর্যাগীতির ভূমিকা কলিকাতা ১৯৮৯

আশা দাস, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি

দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ

ধর্মানন্দকোশাম্বী, ভগবান বুদ্ধ (অনূদিত সং), নঈ দিল্লী ২০০১ (৩য় সং)

ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন

— অনুবাদ : মধ্যম নিকায়

— ঐ মিলিন্দ প্রশ্ন

— ঐ বৌদ্ধদর্শন (রচয়িতা রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন)

ডাঃ নাজিম-উদ্দিন আহমদ, মহাস্থান, ময়নামতী ও পাহাড়পুর

নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর উৎপত্তি বিবিধ প্রবন্ধ (২য় খণ্ড), কলিকাতা ১৩০৮ বঙ্গাব্দ

বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলিকাতা ১৩৯১ বঙ্গাব্দ

বিমল চন্দ্র দত্ত, বৌদ্ধভারত, কলিকাতা ১৯৮০

যুধিষ্ঠির জানা, বৃহত্তম তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৮২

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, কলিকাতা ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস

শশিভূষণ দাসগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, কলিকাতা ১৯৬৫

শ্রী ধর্মপাল ভিক্ষু, বাংলার সত্যসূর্য : অতীশ দীপংকর (বেণু প্রসাদ বড়ুয়া) প্রকাশিত, কুমিল্লা ১৯৭৯ খৃঃ

সৈয়দ আলী আহসান, চর্যাগীতিকা ঢাকা, বাংলা সাহিত্য একাডেমী, ১৯৮৪

বাঙলা (পত্র-পত্রিকা)

কল্যাণ মিত্র, ভারতীয় জনমানসে বুদ্ধভাবনার দ্বৈরথ, *নালন্দা* পৃ. ৫৩-৫৫, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৫৪৩ বুদ্ধাব্দ।

জগজ্জ্যোতি অতীশদীপঙ্কর সংখ্যা, সম্পাদক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, জানুয়ারী ১৯৮৩
জয়দেব রায়, শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য, *নালন্দা* ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৯-২০
ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান *চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ৫২শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা
দেবব্রত বড়ুয়া, বৌদ্ধসাহিত্যে নব-নারীর প্রেম, *নালন্দা* ২৫২৮ বুদ্ধাব্দ ২য় সংখ্যা
দীপককুমার বড়ুয়া, নালন্দা মহাবিহারের মহাধ্যক্ষ বাঙালী ধর্মনিধি শীলভদ্র, ধম্মচাক্কং বুদ্ধাত্রিরত্নমিশন, নঈ দিল্লী ২৫৫০ বুদ্ধাব্দ
ধর্মাধার মহাস্থবির, বিগত শতাব্দীর বৌদ্ধসমাজ ও সঙ্ঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ১ম সংখ্যা *নালন্দা*
— মহাস্থবির অভয়াশরণ, নালন্দা ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ৪র্থ সংখ্যা
— বৌদ্ধসমাজে ভিক্ষুসঙ্ঘের ভূমিকা ২৫২৭ বুদ্ধাব্দ ২য় সংখ্যা
— ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধসমাজ ২৫৩২ বুদ্ধাব্দ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
পীযূষ কান্তি বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায় : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যা দেখেছি, যা জেনেছি, অনোমা, ২৫৫২ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৩২)
(ডা:) পুলক মুৎসুদ্দি, বাঙ্গালী বৌদ্ধসমাজ, *নালন্দা* ২৫৩০ বুদ্ধাব্দ ২১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
পুলিন বড়ুয়া, বাঙালী অতীশ কথা, *নালন্দা* ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৪-১৬
প্রণব কুমার বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্মে লোকাচার, *নালন্দা* ২৫২৯ বুদ্ধাব্দ ২০ বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ. ৩৫-৩৮
— বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী ময়নামতী, নালন্দা ২৫২৬ বুদ্ধাব্দ ১ম সংখ্যা
প্রমোদ রঞ্জন বিশ্বাস, পাহারপুর বুদ্ধমন্দিরে গ্রাম বাংলার জীবনচিত্র, *নালন্দা* ২৫২৭ বুদ্ধাব্দ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
(ড:) সুনীতিভূষণ কানুনগো, ঊনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধসমাজে নবজাগরণ, *অনোমা*, ১৯৯৯ পৃ. ২৯
সুনীতিকুমার পাঠক, দূরদর্শী রাজা অশোক, *নালন্দা*
সুমঙ্গল বড়ুয়া বুদ্ধমূর্তির উদ্ভব ও কিছু প্রসঙ্গ, *নালন্দা* ২৫৩২ বুদ্ধাব্দ ৩২ ও ৩৩ সংখ্যা
রাহুল মজুমদার, বৌদ্ধ সহজযান, অনোমা, ২৫৫২ বুদ্ধাব্দ পৃ. ৭৫-৭৮
ধর্মাধার মহাস্থবির, বিগত শতাব্দীর বৌদ্ধসমাজ ও সঙ্ঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ১ম সংখ্যা *নালন্দা*
— মহাস্থবির অভয়াশরণ, নালন্দা ২৫১৬ বুদ্ধাব্দ ৪র্থ সংখ্যা
— বৌদ্ধসমাজে ভিক্ষুসঙ্ঘের ভূমিকা ২৫২৭ বুদ্ধাব্দ ২য় সংখ্যা
— ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধসমাজ ২৫৩২ বুদ্ধাব্দ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

ইংরাজী ও ইউরোপীয় ভাষায়

Ahir D. C. Himalayan Buddhism, Past and Present, Shri Satguru Pubn. Delhi 1993.

Banerjee Anukul Chandra, Sarvastivadi Literature Calcutta Uni. 1938.

Bhattashali, N. K. *Iconography of the Buddhists and Brahmananical Sculptures in Dacca.* Dacca.

Chattapadhya D. P. (ed.), *Taranath's History of Buddhism in India. (Eng.* tran of Pgya, gar ehos byung Lama Chimpu Alaka Chattapadhyaya, Motdital Banarasi class 1997, Delhi.

Hutchinson R. H. Snyed. *Gazatteer of the Chittagong Hill Tracts District*, London 1909, Delhi, 1978.

Law B.C. *Tribes in Ancient India,* Pune 1973

MZitra Debala, *Buddhist Manuments*

Majumder R. C, *Ancient India,* McBD, Delhi 1994

Obermillar, English trans. Buostonichos byung *A History of Buddhism* 2 vols. Heidelberg 1911-12.

Pathak S. K, The Culture-scape of the Buddhists in North East India, *New Trends in Indian Art and Architecture, S. R. Rao's* Felicitation Volume, Aditya Prakashan, Delhi 1994

Radhamohon Chakravarti, *Contributions of Comillo to the Buddhist Culture in Ancient Times.*

Rahula Walpola, *History of Buddhism in Ceylon.* Colombo 1936.

Risley H. H., Tribes and Castes of Bengal, Vol. I & II Firma K. L. Mukhapadhyay, Calcutta 1981

Sankarnarayan K et al (ed), *Buddhism in India and Abroad. An Integretic Influence in Vedic and Post-Vedic Perspective,* Mumbai, 1996.

Sengupta Sukumar, *Buddhism in South East Asia,* Calcutta 1994

Watters, *On Yuan Chwang : Travels in India.*